রণকৌশল : ১

সীমান্ত খুলে দাও

আনোয়ার হোসেন লালন

রণকৌশল-১

সীমান্ত খুলে দাও

আনোয়ার হোসেন লালন

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

রণকৌশল-১

সীমান্ত খুলে দাও

আনোয়ার হোসেন লালন

❑

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ শফিকুল ইসলাম (শফিক)

❑

❑

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৩

❑

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০০৩

❑

প্রকাশনায় ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭২-২৯৩৩৭২

❑

দাম ঃ সত্তর টাকা মাত্র

সীমান্ত খুলে দাও

[বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মুসলিম জাতির নব জাগরণ
ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী উম্মাহর পুনরুত্থানের স্বপ্ন
নিয়ে রচিত কল্প-উপন্যাস]

ঔপন্যাসিক ঃ
আনোয়ার হোসেন লালন

উপদেষ্টা ও সম্পাদকঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সীমান্ত খুলে দাও ॥ পাসঙ্গিকী

গল্পকার ও ঔপন্যাসিক আনোয়ার হোসেন লালনের লেখার সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের। দরদ দিয়ে লিখতে পারেন তিনি। সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বের নানা বিপর্যয় সংবাদে তার লেখক মন বিচলিত হলে তিনি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নবজাগৃতি বিষয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার প্রেরণা অনুভব করেন। একদিন সাক্ষাতে লেখার ধারণা বিনির্মাণ শেষে তিনি লেখার আকৃতি নির্মাণ করে ফেলেন খুব দ্রুত।

সীমাহীন ব্যস্থতা সত্ত্বেও তার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে এবং নানাদিক বিবেচনা করে সম্পাদনার নানাবিধ উপাচার প্রয়োগ করে বইটির বর্তমান রূপ পাঠকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশে এ ধরনের বই আর রচিত হয়নি। তাছাড়া সহসা হবে বলেও মনে হয় না। কারণ, কোন ঔপন্যাসিকের খামখেয়ালি বা কল্পনা বিলাস থেকে এ বইয়ের জন্ম নয়। এ বইয়ের পেছনে রয়েছে সুগভীর ভালোবাসা, দৃঢ়তার ঈমান আর অনুপম ভাবাবেগ।

তত্ত্ব, তথ্য ও অলংকারে পূর্ণ এ বইটি সচেতন পাঠকমহলকে মুগ্ধ করবে। কাহিনীর নায়কদের সাথে পাঠকও ঘুরে বেড়াবেন ঘটনার বাঁকে বাঁকে। 'কিতাব কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত পরবর্তী আরো বইয়ের প্রতি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে যেন আমরা সক্ষম হই। আশা জাগানিয়া সাহিত্যের পরশে পাঠককুল জাগ্রত হোন-এ উপলব্ধিটুকু সম্বল করে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বলতর করুন।

বিনীত ঃ

ঢাকা ॥ ফেব্রুয়ারী ২০০৩

উবায়দুর রহমান খান নদভী

ফ্যাকাল্টিতে বসে কম্পিউটার গ্রাফিক্স এ একটা ডিজাইন করছে তাসনিম। শায়লা এক প্রকার দৌড়ে এলো তার দিকে, হা পিত্যেশে প্রাণের মানুষটির উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইলো সে– তুমি পালিয়ে যাও, তাসনিম। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!

তাসনিম যেনো কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ক্লোজ ম্যানুতে ক্লিক করে দক্ষ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো ঝটপট। প্রিয়ার চোখে চেয়ে বিস্ময় ঝেড়ে বললো– কারা আমাকে মেরে ফেলবে! আর কেনোইবা মেরে ফেলবে! আমিতো কোনো অন্যায় করিনি। শায়লা কালো এক্সফাইল বুকের কাছে আরো জোরে চেপে ধরে বললো তুমি ইসলামপন্থী। ইসলাম বিরোধী চক্রের চোখে এটাই তোমার অপরাধ। আজ ওরা ইসলামী নেতৃত্ব খতম করার অপারেশনে নেমেছে। এখন ওরা হায়েনার মতো ক্ষেপেছে, টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা যাকে পাচ্ছে, তাকেই জঘন্য কামড় বসিয়ে দিচ্ছে। ওরা তোমাকেও খুঁজে ফিরছে। তুমি পালিয়ে যাও জীবন, পালিয়ে যাও...

তাসনিম বাহুতে ঝাড়া দিয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠলো– নাহ! অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে আমি যাবো না। বরং আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো, গুড়িয়ে দেবো মিথ্যের ভিত। আমি সত্যের জন্য যুদ্ধ করবো, শায়লা। আমি আল্লাহর নামে জিহাদ করবো।

শায়লা আচমকা কেমন কেঁপে উঠলো। বোরকার নিকাব ঠিক করতে করতে বললো- কিন্তু তাসনিম, তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, এই মুহূর্তেই তুমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, ওরা দলে ভারি, ওদের অনেক অস্ত্র, ওরা বড় পাষাণ, তোমাকে ওরা কোরবানীর পশুর মতো জবাই করে ফেলবে। আমি তোমাকে হারাতে পারবো না, তাসনিম, আল্লাহর কসম তুমি পালিয়ে যাও।

– শায়লা!

– হ্যাঁ প্রাণটি আমার। জলদি যাও, ওরা এসে পড়বে এদিকে।

তাসনিম আর কিছু ভাববার সুযোগ না পেয়ে অগত্যা বললো- ঠিক আছে, বোরকাটা খুলে দাও তবে। শায়লা বিদ্যুৎগতিতে বোরকা খুলে তাসনিমকে

পরিয়ে দিলো। কালো বোরকা পরে একেবারে পর্দানশীন নারী বনে গেছে তাসনিম। শায়লা মৃদু হাসলো। চোখ দিয়ে ইশারা করে বললো- কুইক!...

তারপর একসঙ্গে তারা দোতালার সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলো নিচে।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বোমা গুলির খই ফুটছে। বারুদের গন্ধে স্নান করছে বাতাস। কতোজন আহত আর কতোজন নিহত হচ্ছে তার হিসেব কেউ করছে না। তাসনিম আল্লাহ নাম মুখে নিয়ে শায়লার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরে। বোমা-গুলি পাশ কাটিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পার্কিং-এ এসে ঢুকলো তারা। স্বীয় মোটর সাইকেলে চেপে বসেই তাসনিম বাতাসের গতিতে ছুটলো। পেছনে শায়লা তাকে জোরে আকড়ে ধরে আছে।

চলন্তাবস্থাতেই বোরকা খুলে শায়লার হাতে ধরিয়ে দিলো তাসলিম। শায়লাও সাইকেলে বসেই যতদূর সম্ভব জড়িয়ে নিলো বোরকা সেট। শায়লাদের বাসা উত্তরা মডেল টাউনে আর তাসনিমদের বাসা পুরান ঢাকার লক্ষী বাজারে। শায়লাকে বাসায় পৌছে দিয়ে তবেই তাসনিম নিজেদের বাসায় ফিরবে ভেবে শাহবাগ হয়ে ফার্মগেটের দিকে ছুটে চলতে লাগলো। কিন্তু, শায়লা এতে আপত্তি সাধলো– আমাকে নিয়ে এত ভেবোনা। এখানেই নামিয়ে দাও, আমি যেতে পারবো, তুমি সেইফ হয়ে নাও আগে।

তাসনিম এ কথায় কান দেয়না। গতি আরো বাড়িয়ে দেয় সে। মুহূর্তেই জাহাঙ্গীর গেট ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় মহাখালীর সীমানায়।

মাগরিবের আযান পড়ে যায় এরিমধ্যে। তাসনিমের বুকের তলে কেমন ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। আযান পড়লেই মসজিদের পথে পা বাড়াতে না পারলে, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না তার। আযান শুনে মোটর সাইকেলের গতি অর্ধেক কমিয়ে দেয় তাসনিম। রাস্তার পাশে একটা জামে মসজিদ দেখলে সাইকেলটা সেখানে ষ্ট্যান্ড করে। শায়লাকে অপেক্ষা করতে বলে নামাযের জন্য মসজিদে চলে যায় সে।

জামাআত এখনো শুরু হয়নি। ইকামতের আগে পেশ ইমাম সাহেব বললেন- প্রিয় ভাইয়েরা আমার, নামায শেষে আপনারা কেউ যাবেন না। মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে। এই মূল্যবান বয়ানে আপনারা সকলেই অংশগ্রহণ করবেন।

নামাজ শেষে তাসনিম ভাবলো, গুরুত্বপূর্ণ বয়ান যখন, তখন একটু শুনেই যাই, একবার মসজিদের বাইরে বেরিয়ে এলো তাসনিম, একটু দূরে মোটর সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শায়লা তার চোখের দিকে তাকাতেই হাত

ইশারায় তাকে সে অপেক্ষা করতে বললো। তারপর তাসনিম আবার ফিরে এসে দেখলো, বয়ান শুরু হয়ে গেলে। ইতোমধ্যে কাঁচা পাকা লম্বা চাপদাড়িওয়ালা সৌম্যদর্শন এক বুজুর্গ বলে যেতে লাগলেন- এ পৃথিবীতে এত সন্ত্রাস কেনো! কেনো দেশে দেশে এত বিভেদ, এত রেষারেষি, হানাহানি, নোংরামী; কেনো এত অনিয়ম, এত পাষণ্ডতা, এত রক্তক্ষরণ,এত হাহাকার, কেনো এখানে মিথ্যের এত দাপঢ, কেনো এখানে সত্যেরা কেঁদে মরে গুমোট ব্যথায়! কেনো এখানে জালিমের এত সম্মান! কেনো এখানে এবং কারা এ বিশ্বের মোড়ল সাজতে চায়। আসলে বিশ্বনেতা কাদের হওয়া উচিত। কারা পরিচালনা করবে এ পৃথিবী! আল্লাহ ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তারই ইবাদত বন্দেগী করবার জন্য। পৃথিবীতে সত্যের ফুল ফোটাবার জন্য। রূপালী চাঁদের স্নেহযুক্ত জ্যোৎস্নার মতো সমাজ কায়েম করার জন্য। আল্লাহ মানুষের জীবনে নির্ধারিত ছক বেঁধে দিয়েছেন। সে ছকের বাইরে গিয়ে ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ে যারা এ পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে কারা এসেছিলো এ পৃথিবীতে। তারা আজ কোথায়, কোথায় ওমর ফারুক (রা.), মুহাম্মদ বিন কাসিম, কোথায় গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী, নূরউদ্দীন জঙ্গী, কোথায় সৈয়দ আহমদ, বালাকোটের হাতিয়ার, কোথায় হাসানুল বান্না, কোথায় খাত্তাব আর কোথায় সে মুসলমান, তোমরা আর কতোকাল ঘুমিয়ে থাকবে। এবার জেগে ওঠো। ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখো, কী দারুন সন্ত্রাসের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে বিশ্বময় সকল সুন্দররাজি। আর কতো ধ্বংস চলবে আল্লাহর এ জমিনে। আর কতো নির্যাতিতা মা-বোনের বুক ফাটা আর্তনাদে ভারি হবে আকাশ, আর কতো ভূখা নাঙ্গা অসহায় শিশুর ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনি তুলবে। আর কতো কাল কেঁদে যাবে ফুল পাখি, এ পৃথিবী আর কতোকাল হাহাকার করে যাবে। তাই সময় থাকতেই বিশ্ব মুসলিম এক হও। সাম্য সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলো প্রতিটি মুসলমান প্রতিটি মুসলমানের সঙ্গে। তা না হলে, আজ যেমন ভার্সিটিতে নিরপরাধ ইসলামপন্থীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলমানের ওপর ইসরায়েল ইয়াহুদীদের কামান দাগানো হচ্ছে, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, কাশ্মীর, ইরাক, আফগানসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মহাসন্ত্রাসের ষ্টিম রোলার চালানো হচ্ছে, তা চলবেই। এই জঘন্য সন্ত্রাস লীলা সাঙ্গ করে দেয়ার মতো সাহসী বীর কেউ কি নেই এ বিশ্বে!

তখনি তাসনিম কিছুটা লাফিয়ে উঠে ডান হাত উঁচু করলো। গলা ছেড়ে বললো– আছে ...।

উপস্থিত সবাই একবার তার দিকে ফিরে তাকালো এবং মুহূর্তেই তারাও অনুরূপ বলে উঠলো– আছে... আছে...।

এরপর মাওলানা সাহেব বললেন- আমাদেরকে মুসলমান হয়ে কেবল ঘরের কোণে বসে থাকলেই চলবে না। মুসলমান শব্দের অর্থ জানতে হবে। মুসলমানের ইতিহাস জানতে হবে। ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি জিহাদ করতে হবে।

এরপর একটু থেমে বক্তা ফের বললেন- ভাইসব, এখন আপনাদের মাঝে জিহাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক একটি সহি পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। আপনারা যাবার আগে উক্ত পুস্তকটি সকলেই নিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।

পুস্তক নিয়ে তাসনিম মাওলানা সাহেবের সঙ্গে মোসাফা করলো, মৃদু হাস্যপরিবেশন করে বললো- আপনাকে ধন্যবাদ, খুব ভালো বক্তৃতা দেয়ার জন্য।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে তাসনিম প্রিয়ার দিকে চোখ ফেলে অনুতাপ স্বীকারের ভঙ্গিতে বললো– সরি, বয়ান শুনতে গিয়ে একটু লেট হয়ে গেলো।

বললো– তা হোক, কিন্তু আমাকে তো মাগরিব কাজা করতে হবে। তাসনিম মোটর সাইকেলে চড়েই বললো। কাজা করবে কেনো, বসো। শায়লা পেছনে চেপে বসতেই দ্রুতবেগে ছুটলো তাসনিম। উত্তরার সীমানায় আসতেই তার পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠালা, –ধরোতো কলটা। বললো তাসনিম, শায়লা তার জামার পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে আনলো, অন বোটাম টিপ দিয়ে কানে লাগিয়ে বললো– হ্যালো, আস্‌সালামু আলাইকুম।

এরপর শায়লা মোবাইল সেট তাসনিমের কানের কাছে ধরে বললো– তোমার মা।

তাসনিম মায়ের কাছে জানতে চাইলো– কি ব্যাপার আম্মা, কোনো সমস্যা?

আম্মা বললেন– সমস্যা নয়, আবার সমস্যা!

– যেমন!

– এইযে তুই এখনো ঘরে ফিরছিস না, তাই। তোর আব্বুও খুব টেনশনে আছেন, তাসনিম।

– ক্যানো!

– বিকেলে তুই ভার্সিটিতে গিয়েছিস, আর ভার্সিটিতে না-কি গণ্ডগোল হয়েছে।

– এই নিয়ে তোমরা ভেবোনা, আম্মু, আমি ভালো আছি। আর আমি এখন উত্তরায়।

– সেকি! রাত্র করে অতদূর গিয়েছিস ক্যানো। শিগগির বাসায় ফিরে আয়।

– আসছি মা, ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের ভেতরেই চলে আসছি। মোবাইল অফ করে মোটর সাইকেলের গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিলো তাসনিম। পলকেই চলে এলো গন্তব্যে। 'ক্ষণিকের নীড়' বিল্ডিং এর সামনে শায়লাকে নামিয়ে দিয়ে তাসলিম বললো -সরি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ খুব দ্রুত কিরে যেতে হচ্ছে। ঘরে ঢুকতে পারছিনা। তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো।

শায়লা বললো– এ নিয়ে তুমি ভেবো না, আমরা তো একে অপরকে বুঝি। সুতরাং বাকীরাও বুঝবে।

তাসনিম বললো– অবশ্যই। কিন্তু বিপদে পড়ে এ অসৌজন্যটুকু হয়ে গেলো। তো চলি আজ।

শায়লা বললো- যাও, ভালো থেকো।

– তুমিও ভালো থেকো। ফোন কোরো। বলে তাসনিম লক্ষীবাজারের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল ঘুরালো। তারপর 'আল্লাহ হাফিজ' বলেই শা শা করে দিলো ছুট।

তাসনিমের আরেক নাম 'মাহের আল জিহাদ' বা আল্লাহর নামে দক্ষ জিহাদকারী। নামটা রেখেছিলেন তার পিতা বজলুল্লাহ সাহেব। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় তাসনিম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দাওরা পাস করে ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ-এ মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে। কেবল ভার্সিটিতেই লেখাপড়া করেনি তাসনিম, একই সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটেও পড়েছে কমম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। এ ছাড়া দূরশিক্ষণের প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ থেকে আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজী কোর্স করেছে। শুধু শিক্ষার্জনেই সময় কাটায়না তাসনিম। এই তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন তরতাজা যুবরাজ বরং একটি শক্তিশালী ইসলামী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। তার পাশাপাশি ব্যস্ত থাকে পাঠসূচী বহির্ভূত বইপুস্তক নিয়ে। বাসায় নিজস্ব একটা লাইব্রেরীও রয়েছে তার। সীরাত, জিহাদ, যুদ্ধ বিষয়ক ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য বিচিত্র শত বই সাজানো রয়েছে শেলফ-এ। সেই সঙ্গে দেশি বিদেশি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পেপার পত্রিকার স্তুপ জমা আছে টেবিলে। আছে কাগজ, কলম, ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, কম্পিউটার। ইন্টারনেটে তাসনিম বর্তমানে লন্ডনের অক্সফোর্ড ভার্সিটিতে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে আর সৌদি আরবের এক ভার্সিটিতে পড়ছে ইসলামি রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে। একজন যুবককে দিয়ে একই সঙ্গে এতকাজ কি করে সম্ভব হতে পারে, তা শিক্ষিত সমাজে বেশ বিস্ময় সৃষ্টি

করেছিলো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাসনিম বলেছিলো– একজন মানুষকে দিয়ে বেশী কাজ করাতে হলে সর্বাগ্রে সময়ের মূল্য দিতে হবে। সময়ের হিসেব অনুপুংখ ভাবে করলেই কাজে এগুনো যায়। লিওনাদো দ্যা ভিঞ্চি বলেছেন– যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে সময় তাদের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে। তবে নামাযই আমাকে এ ব্যাপারে মূল সহযোগিতা করে থাকে। নামায আমার ভালোবাসা, নামায আমার জীবন।

নামাযের প্রতি এই অভূতপূর্ব ভালোবাসা দেখেই শায়লা তাসনিমকে ভালো বেসে ফেলেছিলো। তাদের প্রথম পরিচয়টা হয়েছিলো ইনষ্টিটিউটে, একই সঙ্গে কম্পিউটার পড়েছে দুজন। একই সঙ্গে পাস করেছে। আজ বাদ আছর ভার্সিটিতে একটা প্রোগ্রাম ছিলো তাদের। আরো কজন ভাই বন্ধুর উপস্থিতির কথা ছিল। কিন্তু, হঠাৎ খুনোখুনি লেগে যাওয়াতে তারা এসেও ফিরে গেছে।

ততোক্ষণে তাসনিম মগবাজার হয়ে মালিবাগ পেরিয়ে কাকরাইলের সীমানায় এসে পৌছেছে। কাকরাইল থেকে গুলিস্তানের দিকে যেতে অসহন যানজটে রাস্তাটা আটকে আছে। তাসনিমের অনুভূতি ঈষৎ তিক্ত হয়। বাসায় ফিরতে দেরি হলে মা কষ্ট পেতে পারেন, এই ভেবে তাসনিম মন্ত্রীপাড়ার সীমানা ঘুরে রমনা পার্কের পাশ দিয়ে গুলিস্তান আসার ইচ্ছা করে, মোটর সাইকেলটা ঘুরিয়ে দেয় পশ্চিম দিকে।

হাইকোর্টের সামনেদিয়ে খাজা আব্দুল গনি রোডে মোড় নিতেই দোয়েল চত্বরের দিক থেকে ছুটে আসা একাধিক মোটর সাইকেল আরোহী তাকে তাড়া দিলো। তাসনিম ছুটছে প্রাণপন। শত্রুরাও সক্রিয় হয়ে উঠলো। মোটাগোঁফের এক যুবক পিস্তল তাক করে পর পর গুলি ছুঁড়লো কয়েক রাউন্ড। তাসনিমের মোটর সাইকেলের পেছনের চাকাটা গুলি বিদ্ধ হয়ে দেবে গেলো। সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাসনিম। তবে জিহাদের বইটা হাত থেকে ছাড়লো না। সাইকেল ফেলে রেখে পলকেই সে ছুটে এলো রোডের ডান পাশে। মিলনায়তনের কাছ থেকে দেয়াল টপকে চলে এলো ওসমানী উদ্যানের সীমানায়। শত্রুরাও ছুটে এলো ত্রস্তে। তাসনিম শরীরের সবটুকু শক্তি খাটিয়ে দৌড়াতে লাগলো- আয় আল্লাহ রক্ষা করুন। এই অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিন আল্লাহ।

উদ্যান পেরিয়ে তাসনিম এনটিসি ভবনের গেটে এসে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তাড়াকারী সন্ত্রাসীদের কিছুতেই প্রবেশাধিকার দিলেন না কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ড প্রধান। সন্ত্রাসীরা খামী দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাসনিম ভবনের পেছনের বাউন্ডারি ডিঙ্গিয়ে সিদ্দিকবাজারের সীমানায় চলে এলো। মোড় থেকে একটা রিকসা নিয়ে ছুটে চললো বাসার দিকে। তার বুকটা ভীষণ ফুঁসছে। ঘেমে নেয়ে সারা হয়ে গেছে পুরো শরীর। ডানবাহুর কাছ থেকে একটা গুলি ছেঁচড়ে গেছে। চোয়া চোয়া রক্ত জমা হয়েছে। জ্বালা পোড়া করছে খুব। তবে এই জ্বালা যন্ত্রনার প্রতি খেয়াল নেই তার। তার খেয়াল এখন ঘটে যাওয়া দৃশ্যের ওপর। মাওলানা সাহেবের সেই বয়ানের ওপর। বয়ানের ভাষা বারবার মনে পড়ে তার- এই জঘন্য সন্ত্রাস লীলা সাঙ্গ করে দেয়ার মতো সাহসী বীর কেউ কি নেই। তাসনিম এ কথা ভাবে আর মনে মনে বলে– আছে। ইনশাআল্লাহ এই আমিই একদিন এ বিশ্বে মহাবীরত্বের প্রমাণ দেবো। আর আমি হারবো না কারো কাছে।

লক্ষীবাজার জামে মসজিদ লেন-এর শুরুর বাড়িটাই তাসনিমদের। পাঁচতলা বাড়ি, বাড়ির চারপাশে শাদা বাউন্ডারী। সবুজ গেট।

বাড়িতে ফিরে এসে তাসনিম মায়ের চোখে আবিস্কৃত হতেই মা কেমন আঁৎকে উঠলেন– কিরে খোকা! তোকে এমন লাগছে ক্যানো। কি হয়েছে তোর?

তাসনিম ঈষৎ ঢোক গিললো। এই নাজেহাল চেহারাটা মাকে সে দেখাতে চায়নি। তা-ও দেখাটা হয়ে গেলো। মায়ের দিকে না ফিরে তাসনিম নিজের রুমে যেতে যেতে বললো- আমার কিছু হয়নি, আম্মু। আমি ঠিক আছি। আম্মুও অস্থির ভঙ্গিতে তার পেছন পেছন এগিয়ে এলেন। তাসনিম দাঁড়ালো না। হাতের বইটা বেডের ওপর ছেড়ে দিয়ে টাওয়াল নিয়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

এ বাড়িতে তাসনিমরা দোতালায় থাকে। তাসনিমের ছোট দু'টো ভাই বোন আছে। বোনকে অবশ্যি ছোট বললে চলবে না। সে এখন অনেক বড়। মিরপুর মহিলা মাদ্রাসা থেকে দাওরা পাস করে এখন কবি নজরুল কলেজে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। মারিয়া। আর ভাইটি মোমেন পড়ছে মুসলিম গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি তারা আরো নানান জ্ঞান বিজ্ঞানে তথা তাসনিমের মতো একজন বড় ভাইকে পেয়ে উন্নত মানসিকতায় বেড়ে উঠছে, তবে এর পেছনে মায়ের ভূমিকাই মূখ্য। একজন মা যদি সত্যিকারের ভালো মা হন, তবে তিনি তার ছেলে মেয়েদেরকে চিরদিনই ভালোয় ধরে রাখতে পারেন। তার সন্তানেরা সমাজে সন্ত্রাস করে বেড়ায় না। অপহরণ, খুন, ধর্ষণ করে ফেরে না। কোনো মায়ের যদি কোনো যোগ্যতা থেকে থাকে, তবে সেই যোগ্যতা দিয়ে সে নিজের ছেলে মেয়েকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে যোগ্যতার প্রমান দিয়ে দিক। এইসব আদর্শগত ভাবনা আর দশটা মায়ের

মাথায় না থাকলেও, ইশরাত জাহানের এই প্রত্যয় তার বিয়ের আগে থেকেই। যৌবনে পদার্পনের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন– আয় আল্লাহ, আপনি যদি কোনোদিন আমাকে শাদী মোবারকে আবদ্ধ করে দেন আর আমার কোলে যদি কোনো সন্তান আসে, তবে আমি যেনো তাকে আপনারই পথ চিনাতে পারি।

এরপর বিয়ের পর প্রতিওয়াক্ত নামাযে আল্লাহর কাছে মা বলে যান- আয় আল্লাহ পাক আমাকে সেই তৌফিক দান করুন, আমি যেনো আমার ছেলে-মেয়েদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি। আমার সন্তানেরা যেনো খারাপ হয় না। তারা যেনো চরিত্রবান, সৎসাহসী হয়। তারা যেনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে।

মাতৃআদর্শে বেড়ে ওঠা তাসনিম মাতৃভক্তি প্রশ্নে এখনো সেই সুবোধ শিশুটি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাসনিম মাকে বেডের ওপর বসে থাকতে দেখে নিজের ভেতর ছোট একটা ধাক্কা সামলিয়ে বললো– আম্মু, তুমি এখানেই বসে আছো!

আম্মু চট করে উঠে ছেলের দিকে এগিয়ে এলেন। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ছেলের পুরো অবয়ব দেখতে লাগলেন, কোথায় এতটুকু আঘাতের চিহ্ন মেলে কি-না।

– কি হয়েছিলো বলতো। বললেন ইশরাত জাহান।

তাসনিম বললো।

– কই, কিছুই তো হয়নি।

ডান বাহুর টাওয়েল-এর অংশ আরেকটু টেনে দিলো সে।

মা বললেন- কিছু একটা হয়েছে তো নিশ্চয়ই, আমার কাছে লুকোসনে, বল। না- কি কোথাও হাঙ্গামা বাধিয়ে ছিলিস।

– কি যে বলো মা, হাঙ্গামা বাধাতে যাবো কোথায়, একটু জোরে মোটর সাইকেল চালিয়ে এসেছি তো তাই অমন আগোছালো লাগছিলো।

– তাই বল, তা, তোকে না কতোদিন বলেছি, জোরে কখনো মোটর সাইকেল চালাবিনে, তুই এ্যাকসিডেন্ট করবি, তাই শুধু নয়, অন্য একজনকেও তো এ্যাকসিডেন্ট করতে পারিস।

– ঠিক আছে, মা। আর জোরে চালাবো না।

– খাবি, আয়।

– আসছি মা।

বলে তাসনিম পোশাক পাল্টাতে উদ্যত হলো। মা পাশের রুমে এগিয়ে এলেন। এরিমধ্যে দরোজার ওপাশ থেকে কলিং সুইচ টিপে দিলেন বজলুল্লাহ সাহেব। ইশরাত জানতে চাইলেন- কে?

তিনি বললেন- খোলো।

দরোজা খুলে দিতেই স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বজলুল্লাহ বললেন- তাসনিম ফিরেছে?

ইশরাত বললেন- ফিরেছে।

– ওকে আর ঘরের বাইরে যেতে দিও না, পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

– বলো কি! ওগো, আমার বড়ো ভয় করছে। তুমিও আর ঘরের বাইরে যেও না।

– আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তাসনিমকে নিয়ে ভাবো, আল্লাহ না করুন, একটা কিছু হয়ে গেলে!

তখনি পাশের রুম থেকে এগিয়ে আসে তাসনিম। পিতার কথার রেশ ধরে সে বললো- আপনারা ভেঙ্গে পড়বেন না, আব্বা। আমরা শত্রুর মোকাবেলা করবো।

বজলুল্লাহ কেমন আঁৎকে উঠলেন- এ তুই কি বলছিস, এ-ও কি সম্ভব। ওরা দলে বলে ভারি, অস্ত্র অর্থ সবি আছে ওদের।

– তাই বলে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা চলবে না, আব্বা! টিপু সুলতান বলেছেন, শিয়ালের মতো হাজার বছর বেঁচে না থেকে সিংহের মতো একদিন বাঁচাও উত্তম। সমস্ত অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবো আব্বা। বলেই তাসনিম ডাইনিং রুমে চলে গেলো। ইশরাত বজলুল্লাহ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন– ওগো! এখন কি হবে। তাসনিম যেভাবে জেগেছে, আমার বড়ো ভয় করছে।

বজলুল্লাহ সোফায় বসতে বসতে বললেন- দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও।

ইশরাতও বসলেন বজলুল্লাহর পাশে। দেয়ালে সাঁটানো কাবা শরীফের ছবির দিকে তাকিয়ে কী যেনো ভাবতে লাগলেন তিনি।

এই সতী সাধ্বী নারীকে দেখলেই যে কারুর শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করবে। সমস্ত চেহারা জুড়ে তার অদ্ভুত এক মায়াবী মাতৃত্ব ফুটে আছে। বজলুল্লাহরও স্বাস্থ্য চেহারা খারাপ নয়। লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট, চওড়া বুক, ভরাট মুখে দীর্ঘ চাপদাড়ি। তাকে দেখেও রীতিমতো একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হিসেবে সত্য

জ্ঞানটাই বেরিয়ে আসবে। সত্যিই তিনি আদর্শে অটুট, প্রত্যয়ী নীতিবান, প্রজ্ঞাশীল এক অমায়িক ধার্মিক লোক। গার্মেন্টস শিল্পের ব্যবসা করেন তিনি। ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা ছাড়াও দেশের আরো বিভিন্ন স্থানে সর্বমোট ৭টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩টি বাড়ি রয়েছে তার।

আরো খানিক চুপ করে থাকার পর ইশরাত স্বামীকে বললেন- ওগো, একটা কাজ করলে কেমন হয়?

বজলুল্লাহ ভাবগাম্ভীর্য ভরা গলায় জানতে চাইলেন- কি কাজ?

– চলো, তাসনিমকে নিয়ে আমরা গ্রামের বাড়ি চলে যাই। সেখানে গেলে ও আর আন্দোলন টান্দোলনে জড়াতে পারবে না।

– কথাটা মন্দ বলোনি, তুমি বকুলকে ডেকে সবকিছু গোছগাছ করতে বলো, ইনশাআল্লাহ সকালেই আমরা রওয়ানা হবো।

এরই মধ্যে ডিনার সেরে টাওয়ালে হাত মুছতে মুছতে ড্রয়িং রুমে এগিয়ে এলো তাসনিম– কোথায় রওয়ানা করবেন আব্বা?

ইশরাত সোফা ছেড়ে ছেলের দিকে এগিয়ে এসে বললেন– আমরা গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যেতে চাই তাসনিম। অনেকদিন থাকবো সেখানে।

তাসনিম কিছুটা বিস্মিত হলো,- হঠাৎ এমন উদ্যোগ ক্যানো, আম্মা?

– উদ্যোগটা তোর জন্যই, শহরের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ইসলাম বিরোধীরা যেভাবে ক্ষেপেছে না জানি কখন কি হয়ে যায়।

– আমাকে ক্ষমা করুন আম্মা। গ্রামে আমি যেতে পারবো না।

– তাসনিম।

– হ্যাঁ আম্মা, আমি জিহাদ করবো, মুসলমানের অস্তিত্ব রক্ষার জিহাদ, সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে, বিশ্ব শান্তির পক্ষে জিহাদ।

বজলুল্লাহ বললেন- পাগলামো করিসনে বাপ, তোকে যদি হারাতে হয়, তবে আমার এত গাড়ি বাড়ি, সহায় সম্পত্তি কে ভোগ করবে। একবার আমাদের কথা ভেবে দ্যাখ, বাবা।

– না আব্বা, না। আপনাদের মানা আমাকে ফেরাতে পারবে না। কোরআন পাকেইতো একথা ঘোষিত হয়েছে– যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আমি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তান, আমি একটা ইসলামী সংগঠনের নেতা, আল্লাহ আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। মুসলমানের এমন বিপদের দিনে, আমি

যদি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাই, যদি নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখি, তবে তো আমি বিবেকের কাঠগড়ায় সারাজীবন আসামী হয়ে থাকবো। ইশরাত জাহান ছেলের শরীরে স্পর্শ বুলালেন- খোকা, আমি একজন মা, মা হয়ে সন্তানকে কি করে মৃত্যুর মুখে যেতে দেই। সন্তানের জন্য যে মায়ের মনটা কেমন করে, সে তুই বুঝবিনে বাপ, সে তুই বুঝবিনে। বুঝতিস, তুই যদি আমার মা হতিস আর আমি যদি তোর সন্তান হতাম, তবে বুঝতিস মায়ের কি জ্বালা।

– মা, মাগো, আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, দেশজাতি বিশ্ববাসীর মঙ্গল সাধনে আল্লাহর নামে জিহাদে নিবেদিত হবার মাঝেই তো পরম সার্থকতা। এ সার্থকতা কেবল আমার একারই নয়, আম্মা, আপনারও, কেননা আমি তো আপনারই সন্তান। তখনি কথার রেশ ধরলেন বজলুল্লাহ– কিন্তু, তাসনিম, তুই একা জিহাদ করে কি করতে পারবি বল!

তসলিম বললো– আমি একা নই আব্বা, আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন, আমার সংগঠন আছে, বিশ্বব্যাপী জিহাদী নের্টওয়াক আছে।

– তা হলেও শত্রুদের বৃহৎ শক্তির কাছে তোরা তো মাত্র ক্ষুদে পুঁটি। কেনো ভুলে যাচ্ছিস, এ দেশে যারা ইসলামের বিরোধিতা করে, জন্মসূত্রেই তারা ইসলামের শত্রু নয়। তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর অবলম্বনকারীদের শত্রু হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে রীতিমতো বিশ্বের পরাশক্তি। যারা চিরদিনই মুসলমানের দুশমন,এ অপশক্তিটি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস সাধনের জন্য পরিকল্পিত অপচেষ্টা প্রকাশ্যে অব্যাহত রেখেছে। তারা যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে, মুসলিম বিশ্বের সমস্ত স্বৈরাচারী ও ইসলাম বিরোধী সরকারকে গণপীড়নে আমূল সহায়তা করে যাচ্ছে। সৌদি আরব, মিসর, জর্দান, কুয়েত, তুরস্ক, বাহরাইন, আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিযিস্তানে তাঁদের ঘাঁটি গেড়ে এ দেশ গুলোকে পদানত ও জীবন্মৃত করে রেখেছে। সেভাবে বাংলাদেশে তারা তাদের সামরিক ঘাঁটি গাড়তে চেয়েছিলা। আমেরিকা সব সময়ই এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অন্যদেশকে বাংলাদেশের মোড়ল করে রাখতে চাইছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা চালানো হয় তা-ও ছিলো আমেরিকার যোগসাজশে, শুনেছি আমেরিকার তাঁবেদার ইরানের সাভাক বাহিনীর প্রধান তখন ঢাকায় এসে এই গণহত্যার প্লান এঁকে দেন। বিদেশের কাছে গ্যাস বিক্রির জন্য এখনো আমেরিকা বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষরূপী শয়তান, মানুষরূপী হিংস্র পশু, চিরকালই তারা মানবতার চরম

শত্রু। আধিপত্য বিস্তারের লিপ্সায় এই সাম্রাজ্যবাদী, আগ্রাসী পৈশাচিক দেশ এ যাবত প্রায় নয় হাজার যুদ্ধ সংঘটিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল তারা তাদের শোষণের আওতায় নিয়ে নিয়েছে। ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছে। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ভিয়েতনামের দশ লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে। তারা ইরানের সাথে ইরাকের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে দূরে বসে তামাশা দেখেছে। ১৯৪৫ সালে জাপানে পারমানবিক হামলা চালিয়ে আমেরিকা মানবজাতির ইতিহাসে জঘন্য পৈশাচিক গণহত্যার অধ্যায় রচনা করেছে। এ হামলার তেজস্ক্রিয়ায় আজো সেই নাগাসাকি, হিরোশিমায় পঙ্গু মানুষ জন্ম নেয়। তারা মেক্সিকো, হাওয়াই, ফিলিপাইন, পানামা, গুয়েতমালা, স্পেন, কিউবা, নিকারাগুয়া, লেবানন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদানসহ বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে নিষ্পেষন চালিয়েছে, চালাচ্ছে। তারা খামোখা মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেরাই আবার সন্ত্রাস বিরোধী শ্লোগান দেয়। খোদ জাতিসংঘের তৈরি রিপোর্টে বিগত মহাযুদ্ধে ৬ কোটি মানুষকে হত্যা ও ১৫ কোটি মানুষকে বাস্তভিটা হারা করার সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এ যুদ্ধে এত সম্পদ ও খাদ্য সামগ্রী বিনষ্ট হয়েছে যে, যদি তা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মাঝে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হত, তবে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি তা খেয়ে দেয়ে খরচ করে কমপক্ষে ১০০ বছর সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে পারতো। দেশে দেশে ঢুকিয়ে দেয়া তাদের বেলেল্লাপনা আর অপসংস্কৃতির বিভিষিকায় মুসলমানের ঈমান, আকিদা, তাহজিব, তমদ্দুন বিনষ্ট হচ্ছে। মানুষ লজ্জাহীন, উন্মাদ, ঈর্ষাপরায়ন শোষকে পরিণত হচ্ছে। এতকিছুর পরেও তারা আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বদৌলতে জঘন্য ভয়ঙ্কর চেহারায় সুন্দরের মুখোশ এঁটে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তারা সারাবিশ্বে অপপ্রচার চালাচ্ছে- মুসলমান মানেই না-কি সন্ত্রাসী। তারা মুসলমানের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচার করে যাচ্ছে। আর আমেরিকার সরকার ও প্রচারমাধ্যম উভয়ই ইয়াহুদী পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল তথা পরস্পর একই সূত্রে গ্রন্থিত, অতএব মুসলিম পীড়নের মূল ডিরেকশনটা সেখান থেকেই এসে থাকে। বজলুল্লাহ সাহেব বরাবরই এমনি স্বভাবের মানুষ, একবার যদি তিনি সমাজ,দেশ কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে কথা তোলেন তবে তার শেষ পর্যন্ত বলে ছাড়েন আর তার কথার ভেতরে বাধা সৃষ্টি করার মতো অভদ্রতা অন্ততঃ এই সংসারের কারোর মাঝে নেই।

নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে টি টেবিলে রেখে বজলুল্লাহ সাহেব আবার বলতে লাগলেন- আর এই সেই ইয়াহুদী যারা নবী পাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও প্রধান শত্রু হিসেবে কাজ করেছে। এই ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধেই অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন নবী পাক (সা.)। ইয়াহুদীরা একটি জঘন্য ঘৃনিত জাতি। পৃথিবীতে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে, ষড়যন্ত্রের কূটজাল বিস্তার করতে তাদের জুড়ি আর মিলবেনা। অতীতে কোনো দেশ তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু তারা যুক্তরাস্ট্র আর ইউরোপের সমাজে কৌশলে স্থান করে নিয়েছে। ইয়াহুদী ও খৃস্টান ছিলো প্রকৃতভাবেই জাত শত্রু। সংখ্যালঘু ইয়াহুদীরা সংখ্যাগুরু খৃস্টানদের দ্বারা বেশ ক'বার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। এরপর তাদের সখ্যতা গড়ে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর। বিশ্বযুদ্ধে ইয়াহুদীরাই মার্কিন বৃটিশ মিত্রশক্তিকে অর্থ দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলো। জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে আনবিক বোমা ফুটলো এর ফর্মুলাও গড়ে দিয়েছিলো এই ইয়াহুদীরা। এই ইয়াহুদীরাই মুসলমানের প্রায় সাড়ে তেরশো বছরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী খেলাফত উৎখাত করেছিলো।

তাসনিমের সমস্ত শরীরের রক্ত কণিকা একবার কেমন ছলকে উঠলো। বুকের ছাতি ফুলে গেলো তার। বজলুল্লাহ সাহেব আবার বললেন ইয়াহুদীরা আজ ফিলিস্তিনকে তাদের মাতৃভূমি বানাবার প্রত্যয়ে কতো মুসলিম মায়ের বুক অবিরাম খালি করে চলেছে। খৃস্টানদের সঙ্গে ঐক্য গড়েই তাদের দ্বারা এত কিছু সম্ভব হয়েছে। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার মতো বিদ্বেষের প্রবক্তারা আজ এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। অথচ কী আফসোস যে, আল্লাহর মনোনীত প্রিয় জাতি মুসলমানরা আজ পৃথক বোলে পথ চলছে। বজলুল্লাহ সাহেব এ পর্যন্ত বলতেই ইশরাত জাহান বলে উঠলেন- তাই তো, বিশ্বের মুসলমান দেশগুলো যদি এক হয়ে যায় তবে আর তাদের সঙ্গে পারে কে! ইসলাম তো বিজয়ের ধর্ম সেই ইসলামের অনুসারীরা আজ কেনো এত পিছিয়ে।

তখনি কথার রেশ ধরলো তাসনিম– হ্যাঁ মা, ইসলাম কেনো পিছিয়ে থাকবে! এই প্রতিপাদ্য নিয়েই আজ আমি ঘর ছাড়তে চাই। বিশ্ব মুসলিমকে আজ এক করে দিতে চাই।

বজলুল্লাহ বললেন- চাইলেই সব কিছু পারা যায় না তাসনিম। আবেগ আর বাস্তব এক জিনিষ নয়। তাসনিম বললো- আমাকে মার্জনা করবেন আব্বা। আপনিই তো শিখিয়েছেন সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, আজ সেই সত্যকে

প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয়ে আমাকে যদি ঘরের বাইরে যেতে না দ্যান, জিহাদে যেতে না দ্যান তবে ক্যানো আপনি আমার নাম রেখেছিলেন মাহের আল জিহাদ!!

বজলুল্লাহ সাহেব নিজের ভেতর ধাক্কা খেলেন। তিনি জানেন, প্রতিটি মুসলমান মা-বাবারই উচিত, তার সন্তানকে জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করা। সন্তান জিহাদে যেতে চাইলে তাকে বাঁধা প্রদান আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমান জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নামে স্বীয় পুত্র কোরবানী করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। আরো খানিক ইতস্ততঃ ভেবে তিনি ছেলের প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে পাশের রুমে চলে গেলেন। ইশরাত জাহান কিছু বলতে যাবেন, এরিমধ্যে মোবাইল সেট হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো মারিয়া। ততোক্ষণে মারিয়া বেডরুমের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আম্মু-আব্বু ও ভাইয়ার বলা কথাগুলো শুনছিলো। ছোটভাই মোমেনও ছিলো তার সঙ্গে। তাসনিমের বেড থেকে ভেসে আসা মোবাইলের রিং হঠাৎ তার কানে বাজতেই ছুটে গিয়ে রিসিভ করলো। রিংটা শায়লা করেছে তাসনিমকে। মারিয়া মোবাইল সেট তাসনিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো– ভাইয়া তোমার ফোন।

তাসনিম ফোন কানে লাগিয়ে বললো- হ্যালো।

শায়লা বললো– বাসায় পৌছতে কোনো অসুবিধে হয়নিতো!

– না, আলহামদুলিল্লাহ

– এই জন্যই করেছি। আর ঘুমও আসছিলো না।

তাসনিম কিছু বললনা। মাতা পিতার সামনে বাগদত্তার সঙ্গে কথা বলতে কেমন অপ্রস্তুত বোধ করলো। এরপর হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে আলতো পায়ে নিজের রুমে চলে এলো সে।

শায়লা বলল– কিছু বলো।

তাসনিম বলল– কি বলবো।

– আবার কবে আমাদের দেখা হবে?

– আল্লাহ যখন চাইবেন, তখনি হবে। আর জরুরী কোনো কথা আছে?

– তেমন জরুরী কিছু নেই, তবে তুমি সাবধানে থেকো। জেনে রেখো, তোমার একটা কিছু হয়ে গেলে আমি কিন্তু বাঁচবোনা।

– তুমি ভালো থেকো, খোদা হাফেজ।

বাটন টিপে দিয়ে ফোনটা বালিশের কাছে রাখলো তাসনিম।

আর কতদিন তুমি ভাবীকে উত্তরায় ফেলে রাখবে ভাইয়া। এবার তুলে আনার ব্যবস্থা কর, বলে মারিয়া ভাইয়ার ঘর থেকে বিদেয় নিতে উদ্যত হয়।

ভাইয়া তাকে ডেকে বলে- দরোজাটা টেনে যা আর মাকে বলিস, নামায পড়ে আমি পড়ছি

– আচ্ছা! বলে যা কথা তা কাজ করে নিজের রুমে চলে গেলো মারিয়া। মারিয়া আর শায়লা প্রায় সমবয়সী। তবে শায়লার বয়স কিছুটা বেশী হবে। দেখতে শুনতেও শায়লা মারিয়ার চেয়ে উঁচু লম্বা। অপরূপা শায়লা খুবই পবিত্র চেহারা তার। তবে এই অপরূপ চেহারাটা তাসনিম বিয়ের আগে কখনো দেখেনি, বোরকার বাইরে শুধু জলে ফোটা পদ্মের মতো কাজল কালো চোখ যুগল দেখেছে সে।

শায়লা আর তাসনিম যখন একত্রিত হয়, তখন দুজনকে দেখে মনে হয়, সত্যিই তারা একে অপরের জন্যই এসেছে এ পৃথিবীতে। তারা দু'জন যদি মিলিত না হতো, তবে বোধহয়, অনেক দৃশ্যই অসম্পূর্ণ রয়ে যেতো। জগতের সকল সিনেমা, নাটকের নায়ক নায়িকা ছাড়িয়ে তাদের এই সত্য মহান জুটি সত্যিই বড়ো প্রশংসার দাবীদার। সত্যনিষ্ঠার রুচীতে দু'জনেই ভরপুর তারা। শায়লা যেমন বোরকা পরে চলে, তাসনিমও তেমনি পাঞ্জাবীই পরে, পাগড়ী কখনো পরতে দেখা যায়। পিতার চেয়েও টল ফিগারের অধিকারী সুঠাম তাসনিমের মুখের চাপদাড়িগুলো খুবই দর্শনীয়, মিশমিশে ঘনকালো দাড়িগুলো রাজকীয় ঐতিহ্যের স্মরণ এনে দেয়।

আচরণে তাসনিম পরিচিত মহলে খুব প্রশংসনীয়। ছোটকে আদর ও বড়োকে সম্মান করার অমোঘ বিধানটা বোধকরি তার চেয়ে এতভালো করে আর কেউ মানছেনা। এমনিতেও তাসনিম পৌরুষদীপ্ত সাহসী যুবক। ছেলেবেলা থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তার নেশা। নামায রোযার পাশাপাশি স্বীয় শরীর চর্চায়ও অকৃপন যত্নবান সে। নিয়মিত ব্যায়াম, কায়িক পরিশ্রমও করে যায়। এছাড়া যেসব খেলাধুলায় ইবাদত বন্দেগীর কোন ব্যঘাত ঘটেনা বরং জিহাদ কিংবা যুদ্ধের জন্য শরীরকে যথাপোযোগী মজবুত ও চাঙ্গা রাখে সেসব খেলাধুলায় অংশ গ্রহণও আছে তার। তন্মধ্যে ফুটবল তার প্রিয়। পাশাপাশি মার্শাল আর্টের নানা কলা কৌশল চর্চা করতেও মন্দ লাগেনা। সেই ছেলেবেলা থেকে মার্শাল আর্ট খেলে খেলে শরীরটা ব্রুসলির চেয়েও শক্ত হয়েছে তার। দ্বিতল, ত্রিতল বিল্ডিং এর ছাদ থেকে অনায়াসে লাফিয়ে পরতে পারে সে এবং বিশ ত্রিশজন মানুষের সঙ্গে খালি হাতে জয়ী হবার মতো মনমানসকিতা সব সময়ই পোষণ করে। তাই বলে শত্রুকেও হুট করে মেরে দেয়নি কখনো।

কিন্তু, আজ তাকে মেরে দিতে হবে, সারাজীবন অনেক সেক্রিফাইস করেছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি, কিন্তু আজ আর ছাড় নেই, ভণ্ড ইয়াহুদী, নাসারা, কাপালিক আর তাদের তাঁবেদার, তল্পিবাহক বাতিলদের আজ আর নিস্তার নেই...

বেডে শুয়ে কী রকম ছটফট করছে তাসনিম। তার হাতে সেই জিহাদের বই। বইটার সারমর্ম পড়ে ফেলেছে সে, এ ধরণের বই আরো ঢের পড়া হয়েছে তার। মসজিদের মাওলানা সাহেব যে বয়ান করেছেন, বজলুল্লাহ সাহেব যে আন্তর্জাতিক তথ্য জানিয়েছেন, এসব তথ্য তত্ত্বও তাসনিমের অজানা নয়। তার জ্ঞানের পরিধি অসাধারণ, অসাধারণ তার স্মরণ শক্তি, একবার যা পড়ে তা আর ভোলে না কখনো।

রাত আরো গভীর হলে তাসনিম ভাবে, ঘুমিয়ে আর কী হবে, খানিক বাদে তাহাজ্জুদ পড়ে যা করার করবো। এরি মধ্যে তার আই এস ডি মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠলো। তিনটা রিংএর পরে ফোন রিসিভ করলো তাসনিম– আস্‌সালামু আলাইকুম।

উত্তর এলো, ওয়ালাইকুমুস সালাম। ভাইয়া আমি আবু হিশাম বলছি।

– কি খবর বলো।

– আজ রাত ১টা ৩০ মিনিটে আন্ডারগ্রাউন্ড সেমিনারের সব কাজ ওকে হয়েছে। এখন শুধু আপনার অপেক্ষা।

– ওকে।

– থ্যাংকয়্যু ভাইয়া

– থ্যাংকয়্যূ।

মোবাইল অফ করে ঝটপট তাসনিম উঠে পড়লো। নিঃশব্দে বাইরের পোশাক পরে, প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্তর পকেটে কোমরে নিয়ে জানালার গ্রীল সরিয়ে নেমে পড়লো নীচে।

আণ্ডারগ্রাউন্ড সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হবে রায়ের বাজার ছাড়িয়ে বুড়িগঙ্গার সন্নিকটে পরিত্যক্ত একটা বাড়িতে। চারদিকে বাউণ্ডারী ঘেরা এই জীর্ণ পুরান বাড়িটার গা থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে সেই কবেই। নানান রকম লতা গুল্মে বাসা বেঁধেছে বাড়ির সমস্ত অবয়ব জুড়ে। বাড়ির ভেতরে গহন ভৌতিক পরিবেশ এবং এই বাড়ির নীচেই রয়েছে বিশাল এক আন্ডারগ্রাউণ্ড রুম। শুধু তাই-ই নয়, এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড রুম থেকে বুড়িগঙ্গায় নেমে যাওয়ার সুড়ঙ্গ পথও রয়েছে।

তাসনিম ততোক্ষণে সাতমসজিদ রোড পেরিয়ে গন্তব্যের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। সালাম পরিবেশন করে হল রুমে ঢুকতেই আবু হিশাম সালামের জবাব দিয়ে এগিয়ে এসে বললো- সাধারণ আলোচনার কাজটা আমরা সেরে ফেলেছি। আপনি এখন মূল বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন, ভাইয়া।

– ওকে, বলে তাসনিম তার নির্ধারিত সিটে এসে বসলো, আজকের এ মিটিংয়ে সর্বমোট ৫৭ জন তরতাজা যুবক শরীক হয়েছে।

হলরুমের প্রশস্ত মেঝেতে সবুজ বেড শিটের ওপর আসন সিঁড়ি করে বসেছে তারা। তাদের হাতের কাছে প্রয়োজনীয় বই খাতা-কাগজ কলম ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও রয়েছে। তাসনিম তার মেশিনগানটা হাতে নিয়ে তার সম্মুখ ভাগ খানিক মছেহ করতে থাকলো।

আরো খুটিনাটি কর্ম সম্পাদনের পরে তাসনিম তার বক্তৃতা শুরু করলো–নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসূলিহিল কারিম, আম্মাবাদ। ভাইসব, আমাদেরকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে, শিক্ষা দুই প্রকার, আমরা যদি আল্লাহর শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী, ধনের প্রাচুর্য, বাহ্যিক জ্ঞান আর আকর্ষণীয় সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য চেহারা নিয়ে সদর্পে এ আল্লাহর জমিনে পা ফেলি, তবে তো আমরা ব্যর্থ ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদের আত্মাকে স্বচ্ছ প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশ্বনবীর প্রেম আর বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর ভয়ে নিষিক্ত করে মানবজাতির উপকারে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে সৃষ্টির শুরু থেকেই গোটা বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত, একটা আলোর যাত্রী আরেকটা অন্ধকারের। আঁধার বাদীরা আজ সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ চালাচ্ছে। ইসরাইলি ট্যাংক ও বুলডোজারগুলো ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে অবাধে ধ্বংস লীলা চালাচ্ছে। আগ্রাসনবাদী নরপশুদের হিংস্র থাবায় আজ সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম প্রাণ কঠিন ব্যথায় ব্যথাতুর। কোটি কোটি মানুষের অন্তরে অসন্তোষ ধুমায়িত, প্রশ্ন জাগ্রত, আর কতো মুসলমানের তাজা রক্ত পান করলে ওদের বুকের তৃষ্ণা মিটবে। আর কতো অসহায় মা-বোনের আব্রু নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলবে! আর কতো বইবে রক্তের বন্যা আর কতো মা কেঁদে যাবে আর কতোকাল! শেষের কথাটা তাসনিম হুংকার ছেড়ে বলাতে পুরো হলরুম একবার যেনো কেঁপে উঠলো। মুহূর্তের জন্য তাসনিমের ধমনীতে যেনো শের-এ খোদা আলীর সেই মহাশক্তি চলে এলো;যেনো গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চিপে নির্যাস বের করে তা পান করে বুকের যতো তৃষ্ণা মেটাতে চায় আজ সে।

এরপর একটু থেমে তাসনিম আবার বলতে শুরু করলো প্রিয়সাথী, ইসলাম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, একে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে না পারলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃত কল্যাণময় অবদান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাবো চিরদিনই। সাথী ভায়েরা, চারদিকে আজ ভয়াবহ দুঃসময়। এই ঘোর অমানিশায় একজন পরম বিশ্ববন্ধুর বড়ো প্রয়োজন, সকল কালো ছিন্ন করে যে ফোটাতে পারবে একটি আলোকিত মসনদ, একটি সাবলীল সত্যের ফোয়ারার মতো নির্মলকান্তি বিশ্ব। কে হবে সেই বন্ধু, আর কবে হবে সত্যের জয়। সকল মিথ্যে ধ্বংস করতে কে আসবে এগিয়ে। কে হবে এই ভয়ঙ্কর অভিশপ্তকালের দুর্বার সৈনিক। কে হবে সত্যের বাহক, এই আমাদেরকেই যা করার তা করতে হবে, বন্ধু! কাজী নজরুল ইসলামের 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে' থেকেও আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। এই আমাদেরকেই আজ জাগতে হবে। বন্ধুগণ, পবিত্র কোরআন পাকে মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ, শত্রুর সাথে মোকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থেকো। অতঃপর সুযোগ বুঝে প্রয়োজনানুসারে পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ো।

বন্ধুগণ, জিহাদ সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আমল। এই জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন পাকের আরেক আয়াতে বলেন "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের পরে সন্দেহ পোষন করেনা এবং আল্লাহর পথে জীবন ও অর্থ সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।"

নবী করীম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জালিম বা স্বৈরাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলাই সবচে বড়ো জিহাদ।

অতএব, আজ আমাদের সব সত্য বলতে হবে। সব ভালো নিয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে বন্ধুগণ, জিহাদ ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই। তবে জিহাদে শামিল হবার আগে জানতে হবে, জিহাদ মানেই কারো ওপর হিংসাত্মক কিংবা ধ্বংসাত্মক আক্রমণ নয়। ইসলাম ধ্বংস কিংবা অশান্তি সৃষ্টিকে সাপোর্ট করে না। বরং শান্তি রচনার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে ইসলাম। আইয়ামে জাহেলিয়ার ঘন তমসা ভেঙ্গে দিতে আল্লাহপাক ইসলামকেই প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে। তাই জিহাদের রকমফের বুঝতে হবে। ধারা জানতে হবে– প্রতিরোধমূলক জিহাদ, আক্রমনাত্মক জিহাদ, স্বীয় নফসের সঙ্গে জিহাদ, শয়তানের সঙ্গে জিহাদ, মোনাফিকদের সঙ্গে জিহাদ, কাফের মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ, জাহেরী জিহাদ, বাতেনী জিহাদ, জ্ঞানবুদ্ধি বিতরণ ভিত্তিক জিহাদ,

কলমের জিহাদ, দৈহিক জিহাদ, আর্থিক জিহাদ সম্পর্কে। আশাকরি উপস্থিত সবারই জিহাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে।

তাসনিম আবার বলতে শুরু করলো আমাদের যার যা যোগ্যতা আছে, স্বীয় যোগ্যতা দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষ জিহাদে আমাদের সকলকেই শামিল হতে হবে। এর ভেতরে যারা যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বা যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, সংগ্রহে, ব্যবহারে এবং আরবী-ইংরেজীভাষায় পারদর্শী, যারা সজাগ রণকৌশলী তাদের চারজন আমার সঙ্গে থাকবে। পাঁচজন মিলে আমরা দৈহিক বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরীফ ছুঁয়ে আমরা নেমে পড়বো বিশ্ব মাঝে। বাকীরা সবাই স্বদেশ তথা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও ঢুকে পড়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

মিটিং শেষে সমস্ত জিহাদী ভাইকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলো। ১৩জন করে চারভাগ আর ৫ জনের এক ভাগ। পাঁচজনের দলে তাসনিম ছাড়া অন্য চারজন হলো, যথাক্রমে আবু হিশাম, নকীব, ও আব্দুল মালেক মাখদুম।

ফযরের আযান পড়ার পূর্বেই ৫২ জনের ৪টি দল আন্ডারগ্রাউন্ড হলরুম ছেড়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিদায় হলো। থাকলো কেবল তারা পাঁচজন। অচিরেই কিভাবে তারা পবিত্র মক্কা যেতে পারে বসে বসে তারই শলা পরামর্শ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আবু হিশাম তাসনিমের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো– একটা উপায় আছে, ভাইয়া।

তাসনিম বললো, কি।

– সকাল দশটায় সৌদির উদ্দেশ্যে হজ্জযাত্রীদের একটা ফ্লাইট যাবে। আমরা একটু চেষ্টা করলে সে ফ্লাইটে চড়তে পারবো।

– অবশ্যই। কিন্তু আগে জানতে হবে ফ্লাইটটা কি সরকারী থ্রোতে যাবে না কি প্রাইভেট কোম্পানীর থ্রোতে।

– কোম্পানীর থ্রোতে যাবে, ভাইয়া কোম্পানীর নাম ওয়ার্ল্ড লিং। মতিঝিলে এর হেড অফিস। এমডির বাসা আমি চিনি।

– তবে আর দেরি কিসে, চলো, আমরা সবাই সে বাসায় হাজির হয়ে যাই।

– জ্বী চলুন

বলে আবু হিশাম অন্যান্য সাথীদেরকে তাড়া দিলো। মুহূর্তেই তারা পাঁচজন তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

আবু হিশামের নিয়ে আসা গাড়িতে চেপে বসে। মালিবাগ বাজার রেলগেট ছাড়িয়ে ওরা চলে এলো চৌধুরী পাড়ার বিলাসী এক ভিলার সামনে। ভিলাটা

পাঁচতলা। শ্বেতপাথরে মোজাইক করা সাদা বাউন্ডারী। নিমিষেই তারা পাঁচজন বাউণ্ডারীর ভেতর চলে এলো এবং বাড়ির পেছনের দিক থেকে বেয়ে বেয়ে তিনতলার মোনায়েম সাহেবের রুমে এসে ঢুকলো।

আয়েশে ঘুমিয়ে আছেন পৌঢ় মোনায়েম সাহেব। তাসনিম অন্যদিকে চোখ রেখে সাহেবের মাথায় ঈষৎ বিলি কেটে দিতেই ঘুমটা তার ভেঙ্গে গেলো। আচমকা কজন যুবককে দেখতেই আতঙ্কে কেমন ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি– তোমরা!

তাসনিম পিস্তলটা হাতে ঘুরিয়ে বললে– ভয়নেই, আমরা কেউ খুনী সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজ নই। আমরা এসেছি অন্য একটা প্রয়োজনে।

মোনায়েম ব্যস্তগলায় বললেন- বলো, কি সেই প্রয়োজন।

– আপনার কোম্পানীর একটা ফ্লাইট বাংলাদেশ থেকে হজ্জযাত্রীদের নিয়ে ছেড়ে যাবে, এ কথা কি সত্য?

– সত্য।

– তবে আমরা পাঁচজনও সে ফ্লাইটের যাত্রী হতে চাই।

– কিন্তু এতো অসম্ভব। সিট গুলোতো সব দশদিন আগেই বিক্রী হয়ে গেছে।

– সে হোক, কিন্তু আমাদের যে যেতেই হবে।

আবু হিশাম শান্তগলায় বললো- দেখুন জনাব, আমরা আপনার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করতে আসিনি। বিষয়টা যদি সহজেই আপনি গ্রহণ করেন, তবে কোনো ঝামেলাই হবে না।

মোনায়েম সাহেব বললেন- কিন্তু, আমি কি করতে পারি বলুন, কারো সঙ্গে তো প্রতারণা করতে পারিনা। তাসনিম বললো- প্রতারণা করবেন ক্যানো। এখন যে পাঁচজনকে ক্যান্সেল করবেন পরবর্তী ফ্লাইটে সেই পাঁচজনকে সিট দিবেন আগে।

– কিন্তু...

– কোনো কিন্তু করবেন না, প্লিজ। এই নিন পাঁচলাখ টাকা। পাচলাখ টাকার নোট দেখে বেগম মোনায়েমের মুখ খুললো। স্বামীকে তিনি অনুনয় করে বললেন– ওগো, তুমি রাজী হয়ে যাওনা, বেচারাদের খুববেশী দরকার না হলে কী আর বলে! মোনায়েম সাহেব স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন- ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তখন আর দ্বিমত করি কি করে। টাকা দেয়ার সময় তাসনিম

বললো শুনুন, যতো দিকে যতো ব্যাপার হয়, সব আপনি সামলাবেন, আমরা যেনো কোনো ঝামেলায় না পড়ি, আর আমাদের সঙ্গে যদি কোনোরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়, তবে আপনার কি হবে তা ভেবে দেখবেন। আর পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছার আগেই হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। মোনায়েম সাহেব তড়াক করে বেড ছেড়ে বললেন– না, না, কোনো প্রতারণা নয়, এই আমি এখনি আমার ল্যাপটপ থেকে আপনাদেরকে পাঁচটা টিকেট করে দিচ্ছি। এরপর মোনায়েম সাহেব আগন্তকদের পাশের অফিস রুমে বসতে দিয়ে বাথ রুমে ফ্রেশ হতে গেলেন।

এরিমধ্যে ফজরের আযান হলে ভিলার ভেতরে বন্ধুরা অজু সারতে লাইন ধরেছে। তাসনিমও অজু সেরে এসে সুন্নত পড়ে নিলো, এরপর ফরয ইমামতি সে-ই করে। মোনাজাতে এসে আল্লাহর কাছে গোপন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তাসনিম– আয় আল্লাহপাক, সারা বিশ্বে শান্তি ফোটাবার জিহাদে আমরা আপনার নামে পা বাড়ালাম, পবিত্র কোরআন পাকে আপনি ঘোষণা করেছেন– যারা আল্লাহর নামে ঘর থেকে বের হয়, আল্লাহ তাদের পথ দেখান। আমাদেরকেও সে পথ দেখিয়ে দিবেন দয়াময়। আয় আল্লাহ পাক, আমাদের এই জিহাদকে আপনি কবুল করে নিন, আমীন।

নামায শেষে তাসনিম টিকেট সংক্রান্ত কাজ মিটিয়ে মায়ের কাছে ইমেলে দু'ছত্র পত্র লিখলো।

আম্মাজান,

আস্সালামু আলাইকুম।

আমাকে ক্ষমা করুন আম্মাজান। আমি আপনাদের চাওয়া মোতাবেক ঘরে থাকতে পারলাম না। সমগ্র বিশ্বের কান্না থামাবার জিহাদে আল্লাহর নামে আমি বহির্বিশ্বে চলে গেলাম। আম্মাজান, যদি কোনোদিন ফিরে না আসি তবে আপনি যেনো কাঁদবেন না। আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলবেন আপনি একজন শহীদের মা, আর এই বাণীই যেনো হয় আপনার সবচে বড়ো সান্ত্বনা, শায়লাকে বোঝাবেন। ছোট ভাই বোনকে স্নেহ দিবেন। আব্বাকে সালাম। দোয়া করবেন আম্মাজান।

–আপনার

তাসনিম

তাসনিম মোনায়েম সাহেবের অফিস রুম থেকেই চিঠিটা মায়ের নামে ইমেল করলো। তারপর বন্ধুদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে বিমানটা যখন ওপরে উঠলো, তখনি স্বদেশের জন্য কী নিদারুন এক টান উঠলো তাসনিমের হৃদস্থলে নিগুঢ় আকুতিতে মনে পড়লো ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের সীমান্তরেখা, আটষট্টি হাজার গ্রামের প্রিয়জন্ম ভূমির প্রিয় দৃশ্যগাথা আর চৌদ্দকোটি স্বদেশীকে ছেড়ে যাওয়ার মায়ায় তার কলজেটা যেনো ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের অনেক রক্ত ঝরে সৃষ্টি হলো দু ফোটা চোখের পানি। বিমানে বন্ধুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাসনিম অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চললো।

দুই.

কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট-এ বাংলাদেশ হজ্জযাত্রীদের চার্টার্ড ফ্লাইটটা যখন এসে ল্যান্ড করলো সউদী আরবের সময় তখন বিকাল চারটা বেজে তেরো মিনিট। যাত্রীদের সঙ্গে তাসনিম টিমও লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক বলতে বলতে বিমান থেকে নেমে এলো, বিমানবন্দরের চতুর দিকে চোখ ফেলে তাদের নয়ন ক্ষুধা মিটে গেলো। বুকের তল হয়ে উঠলো আরো প্রশস্ত, এই না হলে কি আর এটা বিশ্বের অন্যতম সেরা এয়ারপোর্ট।

এয়ারপোর্ট এর পুরো রানওয়ে অগণিত বিমান প্রতি মুহূর্তে ওঠা নামা করছে। ঘনশীতের তাড়া খেয়ে সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি বাংলাদেশের অভয়ারণ্যে এসে যেভাবে ডানা ঝাপটায়, এখানকার দৃশ্যটাও যেন ঠিক সেই দৃশ্য।

ছাদহীন লম্বা লম্বা থাম সম্বলিত প্লাটফর্ম ভবনে মর্মর পাথরে নির্মিত তাঁবুর সামিয়ানা খাটানো, তাসনিম এই ভেবে আরো মুগ্ধ হয় যে, এই বিখ্যাত এয়ারপোর্টটা তৈরীর ডিজাইন করেছিলেন বাংলাদেশেরই একজন মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার।

কোটি কোটি টাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত ফেলে রেখে দোকানীরা ছুটে এসে শামিল হন মসজিদে। কেউ কারো মালে অন্যায়ভাবে হাত দিলে হস্তকর্তন করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার যে হুকুম তা এই একমাত্র সৌদি আরবেই পালন করা হয়। এ ছাড়া পবিত্র সৌদিতে নামাজ কায়েমের জন্য 'মোতওয়া' নামক পুলিশ ৫ ওয়াক্ত নামাজের কথা মানুষকে পাঁচবেলা স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা তাদের কথা না শোনে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এসবের ফলেই এদেশে সন্ত্রাসও নেই।

নামায শেষে তাসনিম সাথীদেরকে নিয়ে গেইটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। ইতোমধ্যে হজ্জ যাত্রীদের গাড়ী কাবার পথে ছুটতে শুরু করেছে। তাসনিম গাড়ী ভাড়া করবার আগে এ পবিত্র দেশের আকাশ বাতাস দেখতে লাগলো একবার। এই আরব থেকেই তো মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো, হে পবিত্র দেশ, তোমাকে অনেক ভালোবাসা।

প্রিয় বান্ধবী তামান্না সালওয়াকে নিয়ে গেইট থেকেই বেরিয়ে এলো নুসাঈফা মেহরীন। কাছেই পার্কিং এর দিকে হেঁটে যাচ্ছে তারা। দু'জনেই মোহাবিষ্ট, সুন্দরী যুবতী, দুজনেরই পরনে কালো বোরকা।

আরো ক'পা এগিয়ে এসে মুখোমুখি পথে পাঁচজন তরতাজা যুবককে জড়ো হয়ে থাকতে দেখে নিজের ভেতর কী রকম একবার কেঁপে উঠলো মেহরীন। তাসনিমের মুখে চোখ ফেলে একেবারে থ হয়ে গেলো সে।

নুসাঈফা মেহরীনের চোখে আর পলক পড়েনা। সত্যিই সে জাগতিক সব ক্রিয়া কর্ম ভুলে গেছে। এ যেনো সেই স্বপ্নের পুরুষ, যেমন একজন পুরুষকে কেবল মানস পটেই আবিস্কার করা যায়। আজ তেমন অভূতপূর্ব কল্পপুরুষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত পেয়ে গেলো নুসাঈফা। ছেলেটি সত্যি কি মানুষ, না কি আল্লাহর ফেরেশতা। এত পবিত্র মায়াময় পুরুষমুখ জীবনে আর দেখেনি সে। তার হৃদয়ের কোষে কোষে সবটুকু ভালো লাগার ইমেজ মিশ্রিত হয়ে গেলো। বনহরিণীর চঞ্চলতা ফিরে এলো শরীরের প্রতিটি রক্ত কনায়। এমনতো আর কোনোদিন হয়নি নুসাঈফার। আজ কেনো এমন হচ্ছে। সে কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

নুসাঈফা তখনও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তাসনিম টিম সেদিকে খেয়াল করে না। কতো মানুষই তো আছে। কতো মানুষইতো আসছে, যাচ্ছে। কতো গাড়ী যাতায়াত করছে। সবাইতো সবদিকে খেয়াল করে না, করতে পারে না।

কিন্তু, নুসাঈফার খেয়াল ওই আলোকিত মুখাবয়বেই, স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের জন্য ভেতরটা তার ভীষণ আঁকুপাকু করছে। কিন্তু, চাইলেই তো আর এমনটা সম্ভব নয়, নুসাঈফা ভাবে গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে, ছেলেটা তাকে ব্যক্তিত্বহীনা বলে জ্ঞান করতে পারে। বিন্দু বিন্দু করে গড়ে তোলা আদর্শের ভিত এত অল্পতেইতো ভেঙ্গে ফেলতে পারে না সে। নারী হয়ে জন্ম নিলে অনেক ইচ্ছেকেই প্রশ্রয় দিতে হয় না, দেয়া যায় না। কিন্তু, কথা যে তাকে বলতেই হবে, তাকে যে জানতেই হবে, কে এই অপরূপ সুপুরুষ, আর কি বা তার পরিচয়!

আরো খানিক থমকে থাকার পর নীরবতা ভাঙলো তামান্না সালওয়া। বান্ধবীর বাহুর কাছে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে বললো কি হলো মেহরীন, চলনা। নুসাঈফা মেহরীন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলো। ও হ্যাঁ চল– বলে তামান্নার হাত ধরে পা বাড়ালো সে।

পা বাড়ালেও অন্তর আর সামনে বাড়তে চাইলো না নুসাঈফার। সেখানে অবিরার ধ্বনি উঠছে আরো কিছুক্ষণ থেকে যা, আরেকটু দেখে যা। পথ যেনো চোরাবালিময় হয়ে গেলো, পা যেনো আটকে আসছে তার। এভাবে সে বান্ধবীকে নিয়ে পার্কিং এর কিছুটা কাছে এগিয়ে এলো। একটা বড়ো খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছেলেগুলোকে চোখে চোখে ধরে রাখতে লাগলো, তারা কোথায় যায়, কি করে তার সার্বিক খোঁজ খবর আবিস্কারের আশায় তাদের এই অপেক্ষা।

পোর্ট এরিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চার সহস্রাধিক মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। পুরুষ সৈন্যের পাশাপাশি মহিলা সৈন্যও রয়েছে। তারা সবাই পরিপূর্ণ যৌবনবতী। প্রহরার নামে তারা পোর্ট এরিয়ায় অবস্থান করলেও দিনের বেশীরভাগ সময় স্বল্পবস্ত্র পরিধান করে জেদ্দা শহরে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করে, মার্কেটে যায়, বাগানে যায় আর নানান রকম ভঙ্গিতে পরিবেশকে নোংরা করে। তাসনিম টিম-এর সামনে হঠাৎ এমনি দশ-বারোজন নোংরা মার্কিন মেয়ে আবিস্কৃত হলো। তাদের সবার পরনেই একটা করে ছোট মিনিস্কার্ট। পায়ে পেন্সিল হিল।

পাজেরো থেকে নেমে বেলেল্লা মেয়েগুলো উচ্ছৃংখলভাবে হাসাহাসি মাতামাতি করতে করতে এয়ার পোর্টের ভেতরে ঢুকতে লাগলো।

তাসনিম টিম-এর সবাই, এক নজরের বেশী তাকালো না তাদের দিকে। কিন্তু তারা ভেবে পেলো না, এই পবিত্র দেশে ওই অপবিত্র নরক কীটেরা এভাবে বিচরণ করে কিভাবে! কি করে কার ইন্ধনে বা কোন দুঃসাহসে তারা এ পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করার আস্কারা পায়! এ দেশের জনগণ তাদেরকে কিছু বলছে না কেনো, কি এর রহস্য!

আরো খানিক চিন্তা-ভাবনা করার পর তাসনিম তার বন্ধুদেরকে বললো– বিষয়টা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে।

আবু হিশাম বললো– অবশ্যই।

তারপর তারা যখন এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকতে যাবে, তখনি দেখলো, তদ্রুপ আরো একদল উচ্ছৃংখল মেয়ে কতগুলো সাদা পুরুষের সঙ্গে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে বাইরের দিকে। তাদের মুষ্টিমেয় নারী-পুরুষের পরনে মার্কিন

সৈন্যের ইউনিফরম দেখে তাসনিম ব্যাপারটা বুঝে নিতে সক্ষম হলো এবং তৎক্ষণাৎ তারা সৈন্য সীমানায় এগিয়ে এসে দেখলো তাদের ধারণাই ঠিক। মার্কিন সৈন্যরা তাদের নির্ধারিত সীমানায় ল্যাংটাপুটো হয়ে নানা রকম নোংরামিতে মত্ত। সেক্সুয়াল গান বাজনা বাজিয়ে কেউ নাচছে, কেউ নেশা করছে, কেউ চুমু খাচ্ছে। তাসনিম বন্ধুদেরকে বললো– এসব কি হচ্ছে বন্ধুগণ! এই পবিত্র ভূমিতে এভাবে তো চলতে পারে না। এর একটা কিছু বিহিত আমাদেরকেই করতে হবে।

বন্ধুগণ বললো– অবশ্যই।

তারা কথা বলছে সৈন্য সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে সীমানার ভেতর থেকে স্বল্প বস্ত্রের তিনজন সাদা নারী বেরিয়ে এলো। পাঁচজন টগবগে যুবককে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেহায়া নারীদের ঔদ্ধত্য যেনো বেড়ে গেলো। নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে তিনজনের ভিতরে সবচে যে বেশী সুশ্রী একটা হাত তুলে তাসনিম টিম-এর উদ্দেশ্যে প্রীতি শুভেচ্ছা জানালো– হাই!

এরপর মেয়েগুলো হেলে দুলে তাদের কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু তারা মেয়েগুলোর মুখে বা দেহের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তাসনিম তার মাথার রোমাল খুলে সুন্দরী যুবতীর দেহাবয়ব ঢে দিল। আবু হিশাম ও দেলওয়ারও তাদের রোমাল দিয়ে ঢেকে দিলো অন্য দু'যুবতীর উদোম দেহ। কিন্তু যুবতীরা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা এক প্রকার ক্ষিপ্ত হতে চাইলো। সুন্দরী যুবতীর নাম সিনথিয়া। সে তাসনিমের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময় ঝাড়লো– হোয়াট ইজ দিস্।

তখনি মাখদুম বলে উঠলো– দিস্ ইজ কাঁচা মরিচ। তাসনিম বললো– এই পবিত্র দেশে তোমরা আর এভাবে চলতে পারবে না। এদেশে এভাবে তোমরা চললে, তাতে কেবল এই আরব জাহানই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মুসলমান জাতিকে অবমাননা করা হয়। নবীপাক (সাঃ)কে অবমাননা করা হয়। অতএব আমরা চাই তোমরা এই বেশ পরিবর্তন করো।

সিনথিয়া বললো– ইম্পসিবল! প্রশ্নই ওঠেনা। পৃথিবীতে আমরাই আজ পরাশক্তি। আমরা যেখানে খুশী যাবো। যেমন খুশী চলবো।

তাসনিম চিৎকার করে উঠলো– নো! নেভার....।

ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটার গালে চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ পাক কারো মুখে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া মেয়ে মানুষের গায়ে হাতই বা সে কি করে তুলবে। যেহেতু প্রিয় নবী নারীদেরকে আঘাত

করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এর বিহিত তো একটা করতেই হবে। তাসনিম সিনথিয়াকে বললো– তোমাদের শরীর যেভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে, এভাবেই তোমরা অভ্যন্তরে যাও। প্রধানকে জানাও, আমরা তাকে কল করছি।

সিনথিয়া বললো– আর এভাবে না গেলে?

তাসনিম বললো– দোসরা কোন কথা শুনতে চাই না। যা বলেছি তাই করো, নইলে এ ভূখণ্ডে তোমরা লুটিয়ে পড়বে।

তখনি অন্য এক মেয়ে বলে উঠলো– আমাদেরকে এভাবে হুমকি দেয়ার পরিণাম কতো ভয়ংকর হতে পারে, তা কি তোমরা বুঝতে পারছো?

– কথা বাড়িও না, যাও বলছি! যাও.....।

তাসনিমের কণ্ঠস্বর যেনো আকাশে পৌঁছলো, এরই মধ্যে ক'জন মার্কিন পুরুষ সৈন্য ছুটে এসে অতর্কিতভাবে তাসনিম টিম-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো দু-দলের তুমুল হাতাহাতি।

নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া কিছুটা দূরে লুকিয়ে সবকিছু দেখে শুনে যাচ্ছিলো। যখনি তারা দেখলো, পরিস্থিতি সীমার বাইরে চলে গেছে তখনি তারা পুলিশ কল করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু কর্তব্যরত একদল পুলিশ বিনা খবরেই তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেল ঘটনাস্থলে।

পুলিশের অংশ গ্রহণে দাঙ্গা ফ্যাসাদ মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে এলো সত্য, কিন্তু তাসনিম কিছুতেই হার মানতে চাইলো না। বন্ধুদেরকে নিয়ে সে সোজা চলে এলো এয়ারপোর্টের প্রধান কর্মকর্তার দপ্তরে। মধ্য বয়সী প্রধান সিটেই বসেছিলেন। তাসনিম তার চোখে চোখ রেখে প্রথমে আক্ষেপ প্রকাশ করলো– আপনাদের তো মরে যাওয়া উচিত। আপনাদের জীবদ্দশায়ই যদি আপনাদের নাকের ডগায় পবিত্র ভূমিতে নাসারারা এমন অশ্লীলতার কালিমা লেপন করে দিতে পারে, তবে আর আপনাদের বেঁচে থেকে কি লাভ।

এরপর তাসলিম মার্কিন সৈন্য তথা উচ্ছৃংখল নারী সৈন্যদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করলে প্রধান তার কথায় সায় দিলেন এবং একমত পোষণ করে বললেন,

– অবশ্যই। আপনি একেবারে ঠিক বিষয়টাতেই হাত দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

তাসনিম বললো– আমাকে কিংবা আমাদেরকে ধন্যবাদ জানালেই তো আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলো না। বরং আজ এবং এক্ষুণি সরকারীভাবে এই

অধ্যাদেশ জারীর ব্যবস্থা করুন– মার্কিন নারী-পুরুষ সৈন্যরা উচ্ছৃংখলভাবে অবাধে আর চলতে পারবে না। যদি তাদের চলতেই হয়, তবে কোনো নারী শালীন পোষাক ব্যতিরেকে বাইরে বেরুতে পারবে না।

তাসনিম আরো কিছু বলতে চাইলো। প্রধান তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন– আপনি ভাববেন না। ওরা এদেশে আর থাকতে পারবে না। ওদেরকে এ মাটি থেকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক।

কথা শেষে টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তাসনিম।

তাসনিম টিম এয়ারপোর্ট এরিয়ার বাইরে বেরিয়ে আসার আগেই দেখলো, উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশে সমস্ত মার্কিন সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করছে।

তাসলিম টিম-এর এই ভুমিকা দেখে নুসাইফা ও তামান্না সত্যিকারার্থে আরো বেশী অভিভূত হয়ে এক প্রকার তাদের ভক্ত বনে গেলো। তারা দু'জনই এই টিম-এর পিছু আর কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।

একটা লিমুজিন ট্যাক্সি রিজার্ভ করে তাসনিম টিম ছুটে চলছে পৃথিবীর সর্বসেরা মহাপবিত্রতম স্থান প্রিয় মক্কা ভূমির উদ্দেশে। নুসাঈফাদের ধূসর রঙের অত্যাধুনিক পাজেরোটাও ছুটে চললো তাদের পেছন পেছন। নুসাইফা ড্রাইভারকে আরেকদফা সজাগ করে দিলো– দেখো ভাই, ট্যাক্সিটি যেনো হারিয়ে না ফেলো, ওকেই ফলো করে এগিয়ে যাও। ড্রাইভার বললো– তাইয়েব, তাইয়েব, ইয়া উখ্‌তি।

নুসাইফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া মদীনা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী ইতিহাসে অনার্স করছে। একমাত্র ভাইয়াকে আমেরিকার ফ্লাইটে তুলে দিতে বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নুসাঈফা। মদীনা শহরে তাদের আলীশান বাড়ি। তাঁর পিতা বিশিষ্ট বিজনেস ম্যাগনেট মেশকাতুল আনওয়ার শহরের নাম করা লোক, তিনি বিশ্বের সেরা তিন গাড়ি নিশান, মারসিসি, ভলভো কোম্পানীর এজেন্ট। জেদ্দার কিলো তামানিয়ায় তাঁর বিশাল শো রুম। নাম নুসাঈফা কারভিশন। এ ছাড়াও সৌদিয়ার মূল ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়া দাম্মামেও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মেশকাত সাহেবের।

গাড়ী চলছে। প্রশস্ত রাজপথের দু' পাশে দেবদারু, নিম, সাগু, খেজুর বাগ দেখে দেখে তাসনিম আরো বেশী ভালো লাগার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। খেজুর গাছকে আরো এক ধাপ বেশী ভালোবাসা জানাচ্ছে সে। এই খেজুর গাছ তো পৃথিবীর প্রথম বৃক্ষ। আর ফলের ভেতর এর একটা খেজুর খেয়েই আমাদের প্রিয়

পাক নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরোদিন রাত অতিবাহিত করেছেন আর এ যুগের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন একটা খেজুরের শতো গুণাবলীর কথা।

তাসনিম এমনি উদাস থাকলেও, আবু হিশাম কিন্তু বিচক্ষণ যুবক আর তার এই সব ব্যাপারে সবসময় এ্যালার্ট থাকার পারঙ্গমতা তথা গোয়েন্দা কর্মে পারদর্শিতা দেখেই তাসনিম তাকে এতটা কাছে এনেছে।

সেই প্রথম থেকেই মেয়ে দুটোকে নজরে রেখে চলছে আবু হিশাম এবং তাদের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করে বুকে তার সংশয়ের জাল বুনেছে। ইতস্ততঃ প্রশ্ন এসে মস্তিস্কে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে– মেয়ে দু'টো কি গোয়েন্দার লোক! মেয়ে দুটো কি ইয়াহুদী বা খৃস্টান, যারা মুসলমান বেশে আমাদের পিছু নিয়েছে। আবু হিশাম বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে।

গাড়ি পৌঁছে গেলো পবিত্র মক্কা মোকাররমার গন্তব্যে। এ আকাংখিত ভূমিতে পা রেখেই অশ্রুর বন্যায় তাসনিম মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে অফুরন্ত শোকরিয়া জ্ঞাপন করলো– আয় আল্লাহ, ভালোমন্দ বুঝতে পারার পর থেকেই চিরদিন আকুল হয়ে রয়েছি, আপনার এ পবিত্র কাবা শরীফ আপন নজরে দেখতে পারার মানসে, আয় মহান পাক পরোয়ার দেগার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার দরবারে সহস্র কোটি সিজদায়ে শোকর, আপনি আমার সে আশা পূরণ করলেন।

এই কাবা শরীফের জায়গাটুকুই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সৃষ্টিকৃত জায়গা। জগতপিতা হযরত আদম (আ.) তুরে সাইনা, তুরে যাইতুন, জাবালে লেবানন, জাবালে জুদি এই পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেছেন এবং এর খুঁটি বানিয়েছেন হেরা পর্বতের পাথর দিয়ে, যে হেরা পর্বতের নিভৃত গুহায় আল্লাহর শানে ধ্যানে বসতেন প্রিয় নবীজি (সা.) অবশ্যি পরে ইব্রাহীম (আ.)-ই এই কাবাঘরের পুণর্নিমাতা– প্রবর্তক।

নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়াও এগিয়ে এসেছে তাসনিম টিম এর ছায়া হয়ে। অগুনতি নারী পুরুষের মধ্যে তারা একটু লুকিয়ে থেকেছে।

কাবা প্রাঙ্গনে মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা একটা ভাগ আছে। আর সে মহিলা মহলে বোরকাপরা স্বেচ্ছাসেবিকা ও মহিলা পুলিশ যোগ্যতার সাথে কর্তব্য কাজ পালন করে একথারই প্রমাণ দিচ্ছেন, পর্দা করেও কঠিনতম দায়িত্ব পালন করা যায়। মহিলাদের শরীরের কোনো অংশই দেখা যায় না। তাদের হাতগুলোও হস্তমোজায় আবৃত, পায়েও কালো মোজা।

নুসাঈফারা প্রথমে একবার মহিলা মহলে পৃথক হয়ে গেলেও তাসনিম টিম যখন তওয়াফে শামিল হলো, তখন তারা দুজনও তাদের পেছনে তওয়াফ করতে লাগলো।

এত মানুষের তওয়াফ অনুষ্ঠানে কে নারী, কে যুবতী, কে বৃদ্ধা, কে বড়ো, কে ছোটো, কে কালো, কে ধলো এসবের প্রতি কারও খেয়াল নেই। কারো প্রতি কারোর কোনো মনযোগ নেই। সবার খেয়াল কেবল একই দিকে– আল্লাহ। আর মুখে শুধু একই উচ্চারণ– লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা, সবটুকু সুষমা, আকুতি, কাকুতি ঢেলে দিয়ে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে তাসনিম কাবা ঘরের ধুলিকনা অঙ্গে মেখে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহকে চাক্ষুস অনুভব করে কান্নায় ভেঙে পড়লো– আয় আল্লাহ পাক, জীবনে যতো পাপ করেছি আপনি দয়া করে তা মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে গুণাহ থেকে মুক্ত রাখুন। সারাবিশ্বে শান্তি দিয়ে দিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, রহমত নাযিল করে দিন। মহা সাগরের ঢেউয়ের মতো তার বুকের তলে কান্নার প্লাবন কেবল উথলে উথলে উঠতেই থাকে। এ কান্না যেনো আর থামবার নয়। মনে হয় আরব সাগরে যতো পানি আছে তার চেয়েও বেশী পানি জমা হয়ে আছে তার এইক্ষুদ্র দুটি চোখের সাগরে।

তাসনিমের কান্নার গতি আরো বেড়ে গেলো। তখনি যেনো অদৃশ্য কণ্ঠে ভেসে আসতে লাগলো মহাকালের মহাবাণী– আজ পৃথিবীর সর্বত্রই জুলুমের মাত্রা কেবল বেড়েই চলছে। দেশে দেশে এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নাপাম বোমা, তৈরী ও সংগ্রহের পাল্লা চলছে। একদেশ আরেক দেশকে গ্রাস করার জন্য মহা সন্ত্রাসী সাজে ওঁৎ পেতে বসে আছে। মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে ইয়াহুদী খৃস্টানরা জঘন্য ঘৃনিত অন্যায় অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ সময় এসেছে তাদের এইসব হুমকি ধামকির বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলমানকে যথাযথ জবাব দেয়ার। প্রিয় ধর্মপ্রাণ ভাই ও বোনেরা যারা কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ঈমান এনেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই ভাই ভাই, পরম দরদী, ঘনিষ্ঠতম হিতাকাংখী, নিগুঢ় আত্মীয়তায় আবদ্ধ থাকতে যেনো এতটুকু ত্রুটি না করে। ইসলাম কোনোদিনই অত্যাচার, অনাচার ব্যভিচার, অসভ্যতা, বর্বরতা, পাশবিকতা, অশ্লীলতা, নাস্তিকতাকে সাপোর্ট করেনি। বরং এসবের বিরুদ্ধেই এসেছে ইসলাম। প্রতিষ্ঠিত করেছে একাগ্রতা, সাধুতা, বদান্যতা, সভ্যতা, সততা, সত্য ও মানবতা। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়েই জগতের শ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় রাসূল পাক সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। খুঁজে দ্যাখো, এ পৃথিবীতে যতো

বিশ্ব প্রতিভা এসেছে আলেকজান্ডার, পল, জুডাস, কায়সার, কিসরা, নেপোলিয়ান, সক্রেটিস, প্লেটো, তালিশ, হিটলার, কালমার্কস, মাওসেতুং তারা কেউই তো রাসূল পাকের সমকক্ষ নয়। রাত্রি জাগরন, তাহাজ্জুদ আদায়, ইবাদতে মগ্নতা, মোনাজাতে আহাজারি, তেলাওয়াত, কবর জিয়ারত, মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা সর্বোপরি জিহাদেও সমান ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি (সা.)। কই, তাঁর মতো দৃষ্টান্ত তো কোনো কালে আর কেউই রচনা করতে পারলো না। তারমানে ইসলামই সবার বড়ো, পৃথিবীতে সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামই শ্রেষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য চারখানা আসমানী কিতাবের তাওরাত নাযিল হয়েছে মূসা (আ.)-এর ওপর। যাবুর নাযিল হয়েছে দাউদ (আ.) এর ওপর, ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে ঈসা (আ.)-এর ওপর এবং এই তিনটিকে অকার্যকর ঘোষণা করে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাক নাযিল হয়েছে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং কোরআনই একমাত্র পথ, যে পথ পরিপূর্ণভাবে অবলম্বনে পৃথিবীতে শান্তি নিশ্চিত হয়। কিন্তু, সেই শান্তির বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, মহান আল্লাহর পবিত্র বিশ্বজমিনে অশান্তি রচনায় যারা মেতে ওঠে। তোমরাও আজ তাদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠো। প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ পাক তাঁর ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতোক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন, আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।" তাই তোমরা আর ঘুমিয়ে থেকোনা, সর্বাগ্রে সমস্ত মুসলিম জাতি একই প্লাটফর্মে মিলিত হও। খুলে দাও বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্রের কৃত্রিম ভেদরেখা, মনগড়া সীমান্ত। এক দেশের মুসলিম সন্তান আরেক মুসলিম দেশে যেনো যেতে পারে অনায়াসে। একই দিনারে যেনো সব দেশের ফল, রুটি কেনা যায়। মুসলমানের প্রতি মুসলমানের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ যতোদিন পর্যন্ত রচিত না হবে, ততোদিনে মুসলিম বিশ্বের এই জরাগ্রস্ততা কেটে উঠবে না। তোমরা ঐক্যের গান গাও। তোমরা একের প্রতি অন্যের বুকে অপরিসীম ভালোবাসার দূর্গ গড়ে তোলো, মানুষে মানুষে গলাগলি করিয়ে দাও, পৃথিবীতে সত্যের ফুল ফোটাও। যাও, তোমরা আল্লাহর নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ো। আর মৃত্যুর ভয় কেউ কোরোনা। সবাই আল্লাহর ভয় করো। আর আল্লাহ বলেন– "তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের

ভাই বোন, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা–যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো। এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা করো তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা পর্যন্ত।" অতএব তোমরা জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে যাও। সীমান্ত খুলে দাও! সীমান্ত খুলে দাও!! সীমান্ত খুলে দাও!!!

এই অদৃশ্য অবিস্মরণীয় বানী কি কেবল তাসনিমের কানেই পৌঁছলো! না কি উপস্থিত সমস্ত হজ্জব্রতীদের কর্ণকুহরে পৌঁছে গেলো। সবার অন্তর নতুন করে সজাগ হয়ে উঠলো কি। তাসনিমেরসহ মনে পড়লো এ নামে বাংলাদেশের জাগ্রত এক তরুণ কবি মাওলানা মুহিব খানের একটি কবিতা ও গানের ক্যাসেটে আছে। তাহলে কি আল্লাহ পাক বাংলাদেশের বিপ্লবী কবির "সীমান্ত খুলে দাও" কথাটিকে কবুল করেছেন!

ওমরাহ শেষ করে তাসনিম বন্ধুদেরকে নিয়ে জমজম কূপের পানি পান করে বুকের তৃষ্ণা মিটিয়ে আরাফাতের ময়দানের দিকে গাড়িতে করে এগুতে লাগলো।

এই সেই আরাফাতের ময়দান, পৃথিবীতে নিক্ষেপিত হবার পর জগত পিতামাতা আদম হাওয়া যেখানে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন, আরাফাতের পুরো ময়দান জুড়ে লক্ষ লক্ষ নিমগাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আগে এখানে অবস্থান করতে এসে প্রচণ্ড গরমের তাপে হাজীদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে যেতো। এখন মনে হয় যেনো শীতল মরুদ্যান। উপকারী নিমগাছের ডালপালা পত্রপল্লবের ঘনছায়ায় প্রাণ জুড়িয়ে হাজীরা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হন, আর তাদের আত্মার সেই শান্তি নেক দোয়া হয়ে পতিত হয় বাংলার মাটিতে। এই বাংলাদেশেরই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই আরাফাতের ময়দানে নিমগাছ লাগাতে সর্ব প্রথম উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ইসলামের প্রতি অমোঘ ভালবাসা ছিলো বলেই তিনি তার অপরিসীম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শেষে তাসনিম সাথীদের নিয়ে মুজদালিফায় চলে এলো। অন্যদের মতো পরদিন মিনায় এসে তারাও বড় শয়তানকে পাথর মেরে, মাথা মুড়িয়ে কোরবানী করলো, তারপরদিন আবার নিয়ম মাফিক ছোট শয়তান, মেঝো শয়তান, বড় শয়তানকে কঙ্কর ছুড়ে তাঁবুতে ফিরে এলো।

মিনায় তাসনিম টিম যে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে, নুসাঈফারাও আশ্রয় নিয়েছে তার সন্নিকটের তাঁবুতে। আরো সামনে এগুবার আগে তাসনিমের কাছে বিষয়টা

প্রকাশ করে দিলো আবু হিশাম। মেয়ে দুটো কোনো গোয়েন্দা সংস্থারও হতে পারে। সেই এয়ারপোর্ট থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছে।

তাসনিম বললো, তুমিও তাদেরকে নজরে রেখো। দেখা যাক কি হয়।

তিনদিন মিনায় অবস্থান করার পর তাসনিম টিম বিদায়ী তওয়াফ ও নফল ওমরা করে হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে রওয়ানা করলো। নুসাঈফাও তার বান্ধবীকে নিয়ে আগের মতো ছায়া হয়ে এগুতে লাগলো পেছন পেছন। প্রিয় পাক নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জনে মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করেছে তাসনিম টিম।

চলতি পথে তাসনিম কখনো সখনো থমকে দাঁড়ায় তার কানে বাজে কাবাঘরের সেই অদৃশ্য কথা। বারবার প্রতিধ্বনিত হয়, সীমান্ত খুলে দাও! সীমান্ত খুলে দাও!!

তাসনিম প্রত্যয়ী হয়, সীমান্ত খুলে দেয়ার জিহাদেই অবতীর্ণ হতে হবে। সমস্ত মুসলিম চিত্তে যেনো আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। বিশ্বমুসলিম যেনো সত্যিই আবার বীরত্বে ফিরে আসতে পারে, শান্তিতে ফিরে আসতে পারে। এইসব সংকল্পের সরোবরে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে তাসনিম বন্ধুদের নিয়ে মদীনা শরীফের সীমানায় পৌঁছে গেলো।

এই সেই মদীনা শরীফ, যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন মানবতার মুক্তির দূত সাইয়্যেদুল মুরসালিন। যার আগমন পূর্বে আরব গোত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনবরত লিপ্ত থাকতো। পান থেকে চুন খসলেই তাদের ভেতরে তখন ভয়ঙ্কর বিবাদের সূচনা হতো, একটা মাদী উটের প্রহারকে কেন্দ্র করে বনু তগলিব ও বনু বকরের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিলো। সামান্য ঘোড় দৌড় নিয়ে অসন্তোষের কারণে যুগের পর যুগ যুদ্ধ চালিয়ে ছিলো এ দেশের মানুষ। যখন নারীদেরকে সম্মান করা হতো না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হতো। নারীদের কেবল ভোগ সামগ্রী হিসেবেই ব্যবহার করা হতো, উট দুম্বার মতো নারীরাও প্রকাশ্য বাজারে বিকিকিনি হতো। লুটতরাজ, জোর জুলুমসহ আরো অনেক ঘন তমসায় পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন ছিলো এরাজ্য। মহানবী (সা.) এসে এই আঁধারের ইতিহাস মুছে দিয়েছেন। নারীকে দিয়েছেন যথাযথ মর্যাদা, পৃথিবীকে দিয়েছেন শান্তি।

মানব ও মানবতার সেই পরম বন্ধু শুয়ে আছেন এখানে, তেইশ বছরের নবুওয়াতি জীবনে যিনি একাশিটি যুদ্ধের রণনায়ক ছিলেন, সাতাশটি যুদ্ধে যিনি

নিজ হাতে তরবারি তুলে নিয়েছিলেন। যিনি ঘোষণা করেছিলেন "তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত।"

আধ্যাত্মিক শান্তি ও উদ্দীপনা লাভের কেন্দ্রবিন্দু রওজা শরীফের সম্মুখ ভাগে সোনালী জালি। মূল রওজার চারপাশে সোনার পাঁচিল। রওজা ভবন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এখানকার দায়িত্বান লোকগুলো এতই সচেতন যে, একটা কাগজ খণ্ড পড়লেও জলদি কুড়িয়ে পকেটে পুরে নেয়।

রওজা শরীফ সন্নিকটবর্তী জান্নাতুলবাকী কবরস্তানে অসংখ্য সাহাবীর কবর মোবারকের চিহ্ন পৃথকিকরণে কবরের দু'মাথায় পাথর বসানো রয়েছে। স্থানীয় কিশোরেরা দূর দূরান্ত থেকে আগন্তুকদের কবরগুলো চিনিয়ে দেয়, মুখস্থ বলে দেয়–এটা হযরত আয়েশার (রা.) কবর। এটা মা ফাতিমার (রা.) কবর।

সাহাবীদের কবরস্তানের পাশে কিছু কিছু খালি জায়গায় লক্ষ লক্ষ কবুতর মুক্ত স্বাধীন ওড়াওড়ি ডাকাডাকি করছে। আগন্তকরা গম ছিটিয়ে পাখিদের আপ্যায়িত করে। একঝাক বোমারু বিমানের মতো ছুটে আসা ভঙিতে হাজার হাজার কবুতর দল বেঁধে আকাশে উড়ছে। রওজা শরীফের চারপাশে ঘুরছে। দিনরাত অবিরাম একই রকম চলছে তাদের বিচরণ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই, কোথাও কবুতরে এতটুকু বিষ্টা দেখা যায় না।

জিয়ারতের মোনাজাতে তাসনিম বললো– হে রাসূল পাক, হে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বর্তমান পৃথিবীতে শান্তির জন্য আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের দরখাস্ত খানা পৌঁছে দিন। হে শাশ্বত, হে অনন্ত, হে হৃদয়ালোকবর্তিকা, আপনি সেই দোয়া করে দিন, মহান আল্লাহ যেনো পুনরায় এই পৃথিবীতে রহমতের ঝরণাধারা বইয়ে দেন, যেনো মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করেন।

রওজা শরীফ জিয়ারত করে সাহাবীদের কবর প্রাঙ্গন ঘুরে তাসনিম ভাবলো এ পবিত্র ভূমিতে পদার্পন করার সৌভাগ্য যখন অর্জন হয়েছে, তখন এ কাংখিত ভূমি আরেকটু দেখে যাই। দেখে যাই কোথায় সেই মসজিদ আস সাবাক, যেখানে রাসূল পাক (সা.) স্বয়ং মুজাহিদ সাহাবীদেরকে অস্ত্রচালনা ও ঘোরদৌড়ের প্রশিক্ষণ দান করতেন, যেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে আল্লাহর পথের বীর মুজাহিদরাই বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুকসহ বড়ো বড়ো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইসলামের সর্ববৃহৎ বিজয় সমূহের জন্মদিয়েছিলেন। গুঁড়িয়ে ফেলেছিলেন মিথ্যের যতো ভিত্, আল্লাহর এ ধরাতলে রচনা করেছিলেন অনুপম সোনালী যুগ।

আর কোথায় সেই জাবালে সীলা। যেখানে বসে মহানবী (সা.) খন্দক যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কোথায় মসজিদুল ইজাবা, কোথায় মসজিদে কোবা, মসজিদে জুল কিবলাতাইন, কোথায় মসজিদে কুব্বাতুশ শাইখাইন, মসজিদুন নূর, জাবালে ঈর, কোথায় সেই ওয়াদি বাতহান।

সবগুলো না হলেও নবী পাকের (সা.) স্মৃতি বিজড়িত অন্ততঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ইচ্ছা করে তাসনিম সাথীদের নিয়ে নাশতা পানি খেয়ে প্রথমেই ওয়াদি বাতহানের পথ ধরলো।

ওয়াদি বাতহান মদীনা মোনাওয়ারার এক ঐতিহাসিক স্থান। কী অপরূপ নয়নাভিরাম প্রকৃতি গড়েছেন বিশ্বনিয়ন্তা মাবুদ আল্লাহ। মদীনা মোনাওয়ারার বুক চিরে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত এই শান্ত স্নিগ্ধ বাতহান নবী পাকের (সা.) শুভ আগমনের বহু পূর্বে থেকেই মদীনাবাসীর কাছে বড়ো প্রিয়, এর দু'ধারের জমির উর্বরতায় কৃষিতেও তারা সাফল্য পেতো আশাতীত। মহানবী (সা.) এই বাতহানকে মদীনা বাসীদের জন্য বেহেশতের নদী সমূহের সমতূল্য ঘোষণা করেছেন, এর কাঁদামাটি গায়ে মেখেও রোগ শোক ভালো হয়েছে মানুষের।

তারা নাশ্‌তা খেয়ে বাতহানের সীমানায় ঢুকে পড়লে নুসাঈফারাও এগিয়ে এলো রীতিমতো। আবু হিশাম তাসনিমকে বললো- আর বোধহয় বাড়তে দেয়া ঠিক হবেনা, ভাইয়া, মেয়ে দু'টোকে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করি?

তাসনিম সোজা সাপটা বললো অত অধীর হচ্ছো ক্যানো? তারাতো আমাদেরকে গিলে ফেলছেনা।

– কিন্তু, বিষয়টা ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে।

– আল্লাহ পাক আমাদের কাছে কঠিন বলে কিছু রাখবেন না। সবি সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নুসাঈফা ও তামান্নার ভেতরেও একই রকম ব্যাপার কাজ করে যাচ্ছে। তামান্না শেষতক বলেই ফেললো আর কতো ঘুরবো মেহরীন। নুসাঈফা মেহরীন জবাব দিলো– ঘুরতে থাকি না, দেখা যাক কি হয়।

– কিন্তু লোকগুলো আমাদেরকে কি মনে করছে বলতো।

– যা খুশী তা মনে করুক। আমরাতো তাদের কোনো ক্ষতি করছি না। তারা বেড়াচ্ছে আমরাও বেড়াচ্ছি।

– তবে আমরা কিন্তু অন্যায় করছি।

– প্রেমের ক্ষেত্রে একটু আধটু অন্যায়তো হতেই পারে।

– কিন্তু, কোনো কথা যদি না বলতে পারি তবে আর তাদের পেছনে এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কী লাভ।

– এত অল্পতেই লাভ ক্ষতির হিসেব করিসনে তামান্না। চলতে থাক।

– চলতে তো থাকবোই, কিন্তু তুই দেখিস আমি হুট করে কথা বলে ফেলবো , হ্যাঁ।

– পারলে বলিস। তারা হাঁটতে থাকলো।

বাতহানের পাশে চমৎকার এক খেজুর বাগান দেখে তাসনিমের একটা গানের কলি মনে পড়লো-

"আরবের মরুর মাঝে, খেজুর পাতা দ্যায়রে দোল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল।"

একটু সুর করেই গাইলো তাসনিম। তার বড়ো ইচ্ছে হলো, একবার বাগের ভেতরে প্রবেশ করতে। এইসব গাছের খেজুর চলে যায় বিশ্বের কতো দেশে, তাই হয় মুসলমানের প্রিয় খাদ্য।

বন্ধুদেরকে নিয়ে খেজুর বাগে প্রবেশের পর তাসনিম কী জানি কী ভেবে নুসাঈফাদের গতি একবার লক্ষ্য করলো। দেখলো, তারাও এসে পড়েছে, বাগানের সীমানায়। তাসনিম মনে মনে ভাবলো, সত্যিই বিষয়টা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়টার একটা সমাধান করা উচিত। কিন্তু তাসনিম চাচ্ছে, সে কিংবা তার কেউ তাদের সঙ্গে আগে কথা বলবেনা। যদি বলতে হয়, আগে মেয়েরাই বলুক।

বাগানের ভেতরে ছোটো একটু টিবির মতো জায়গা পেয়ে তারা পাঁচজন সেখানে বসলো। নুসাঈফারা সামনে আর পা বাড়ালো না। কতোগুলো জটলা খেজুর গাছের আড়ালে তারাও বসে পড়লো এবং লুকিয়ে লুকিয়ে যুবকদের দিকে খেয়াল রাখতে লাগলো।

তাসনিমের একটু দূরে তিনটা বড়ো খেজুর গাছ একই সঙ্গে জড়ো হয়ে বেড়ে উঠেছে। মাথা তিনটা আলাদা দেখালেও গাছের শরীর তিনটা একই দেহে বাঁধা, তাসনিম বসে বসে সে গাছটাকে দেখতে লাগলো। একজন আলখাল্লা পরিহিত মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান লোক পেছনের দিক থেকে খেজুর গাছের কাছে এগিয়ে এলো, পকেটের রিমোটে টিপ দিতেই খেজুর গাছের গা থেকে একটা দরোজা খুলে গেলো। লোকটা পলকেই ঢুকে পড়লো ভেতরে, দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো।

তাসনিম ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভাবলো, লোকটা কি আল্লাহর ওলি, ফেরেশতা, না-কি কোনো দুঃশ্চরিত্রের ভণ্ডপীর, নাকি ভয়ঙ্কর কোনো নাশকতাবিদ, গোয়েন্দা! সময় যতো যায়, তাসনিমের অস্থিরতা ততো আরো বাড়তে থাকে। এ রহস্যের শেষ তাকে দেখতে হবে। আবু হিশামের অনুসন্ধিৎসু চোখেও ধরা পড়েছে দৃশ্যটা, এর রহস্য তারা উদঘাটন করতে চাইলো। সবাই মিলে এগিয়ে এলো গাছের কাছে।

নাহ! গাছের কোথাও কোনো দরজা বা ফাটল কিছুই আবিষ্কার করা গেলো না। তাসনিম পকেট থেকে দীর্ঘকায় স্টিলের কলমটা তুলে এনে উপরের দিকে টিপ দিয়ে ধারালো মজবুত একটা চাকু বের করলো। চাকু দিয়ে গাছের গায়ে আঘাত করতেই সে নিশ্চিত হলো এটা গাছ নয়। স্টিলের পাত দিয়ে হুবহু গাছ বানানো হয়েছে। রহস্য আরো ঘনিভূত হয়ে উঠলো। তাসনিমের মুখের দিকে চেয়ে আবু হিশাম বললো– কোনো অশুভ সংকেত মনে হচ্ছে, ভাইয়া।

তাসনিম বললো তাইতো দেখছি। তবে আমাদেরকে ক্ষান্ত হলে চলবে না। এর শেষ আমাদের দেখতে হবে।

– জী ভাইয়া। বললো আবু হিশাম। তাসনিম বললো– ভাবছি, এই কৃত্রিম গাছটা আমরা ভেঙ্গে ফেলবো কিনা। নকীব বললো তাই বোধ হয় ঠিক হবে, ভাইয়া।

– তবে আর দেরি কিসে! ধরো সবাই

অনেক ধস্তাধস্তি করে তারা পাঁচজন অবশেষে স্টিলের গাছটাকে গোড়া থেকে ভেঙ্গে ফেললো। দেখলো গাছের ভেতরটা ফাকা এবং গাছের গোঁড়া থেকে শুরু হয়েছে বিশাল এক সুড়ঙ্গ পথ। পথে নামতে রীতিমতো মোজাইক সিঁড়িও রয়েছে। তাসনিম বললো- নিশ্চয়ই বড়ো কোনো ষড়যন্ত্র। ইসলামের বিরুদ্ধে বৃহৎ কোনো অশুভ শক্তি হয়তো এই পবিত্র নগরীর আমূল ক্ষতি সাধনে এখানে অবস্থান করছে।

মাখদুম বললো- তাই যদি হয় তবে তো ভাইয়া আমাদেরকেই করতে হবে এর প্রতিকার।

তাসনিম বললো- অবশ্যই, আমরাতো আল্লাহর পথের সৈনিক হয়েই ঘর ছেড়েছি, এসো আমরা ভেতরে নেমে পড়ি।

আবু হিশাম মাখদুম একসঙ্গে বললো- জী চলুন।

অসামান্য কৌতুহল বুকে নিয়ে সন্তর্পনে তারা নেমে এলো সুড়ঙ্গ পথে।

কোয়ার্টার কিলো নেমে আসার পর তারা সন্ধান পেলো বিশাল এক হল রুমের এবং সেখানে উপস্থিত বেশ ক'জন নারী পুরুষ আগন্তুকদের দেখে হল একবার কেমন কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা হিংস্র হায়েনার ভঙ্গিতে পিস্তল, মেশিনগান, এলএমজি ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র তাসনিম টিমের দিকে তাক করে ফেললো।

তাসনিম শত্রু পক্ষের প্রধানের কাছে বললো- আমরা তো এখানে প্রাণ দিতেই এসেছি। তো জনাব, আমার একটা অনুরোধ। সবার আগে আমাকেই মারুন।

আবু হিশাম তাসনিমের সামনে এসে তাকে স্বীয় শরীরের আড়ালে রেখে বললো না-না জনাব, ভাইয়ার আগে আমি মরতে চাই।

নকীব ছুটে এসে একই পদ্ধতিতে আবু হিশামকে ডেকে দিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো আমাকে মারুন জনাব।

মাখদুম এসে নকীবের সামনে দাঁড়ালো। না না জনাব, সবার আগে আমাকে মারুন।,

দেলওয়ারও চলে এলো সবার সামনে আমিই মরতে চাই সবার আগে, আমাকে গুলি করুন।

তখনি তাসনিম আবার ছুটে এলো সর্বাগ্রে- না, না জনাব, আমাকেই মারুন।

তারা সামনে এগুতে এগুতে শত্রু প্রধানের একেবারে কাছে চলে এলো। সুযোগ বুঝে তাসনিম হুট করে শত্রু প্রধানের গলায় এক হাতের বেষ্টনি দিয়ে স্বীয় শরীরে চেপে ধরলো। আরেক হাতে শত্রুর অস্ত্রটা কেড়ে নিলো। গলা ছেড়ে বললো সবার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, নইলে তোমাদের বসকে মেরে ফেলা হবে।

বস বললো- ফেলে দাও, অস্ত্র ফেলে দাও।

অমনি শত্রুপক্ষের সবাই যার যার হাতের অস্ত্র নিচে ছেড়ে দিলো, আবু হিশাম, নকিব, মাখদুম ও দেলওয়ার সে অস্ত্রগুলো তুলে নিজেদের আয়ত্বেনিয়ে নিলো।

বিপক্ষের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে অস্ত্রের মুখে নানান প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলো তাসনিম টিম। কিন্তু তারা কোনো প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে নারাজ।

তারা মোট দশজন, ছয়জন পুরুষ, চারজন নারী। নারীগুলো সুন্দরী যুবতী। তাদের পরনে জিন্সের প্যান্ট আর টি শার্ট। পুরুষগুলোর পরনেও এই একই জাতের পোশাক। প্রধানজন বাদে অন্য সবাই বয়সে তরুণ, সুঠাম। তাদের কারো মুখেই দাড়ি নেই, মুসলমানত্বের কোনো চিহ্ন নেই। তাসনিম এই ভেবে আরো অবাক হয় যে, দাড়িওয়ালা যে লোকটাকে গাছের গেট থেকে প্রবেশ করতে দেখলো, সেই লোকটি গেলো কোথায়! তেমন কোনো লোকের চিহ্নই তো এখানে নেই।

আবু হিশাম স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো। হলরুমের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সে। শত্রুদের পোশাক আশাক সরঞ্জামের কাছে এগিয়ে এসে বিচিত্র কিছু সরঞ্জামের সঙ্গে কতগুলো গ্যাস সিলিন্ডারও দেখতে পেলো। হিশামের হিসাব মিললো না। সে ভেবে পায়না, কি কাজে ব্যবহারের জন্য এগুলো এখানে এনেছে। আরেকটু নেড়ে চেড়ে খুঁজতে গিয়ে কতোগুলো পরচুলা ও পরদাড়ি গোঁফ আবিস্কার হলো তার হাতের কাছে। সেগুলো নিয়ে তাসনিমের সামনে হাজির হলো সে। তাসনিমের আর বুঝতে বাকী রইলো না, কোথায় সে দাড়িওয়ালা। শত্রুরা পরচুলা, পরদাড়ি লাগিয়ে আলখাল্লা পরে ফকির বেশে মদীনায় ঘোরাফেরা করে বেড়ায়।

ইসলামের ক্ষতিসাধনে তারা না জানি কোন দুরভিসন্ধির বাস্তবরূপ দিচ্ছে। তাসনিমের সমগ্র শরীরের রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রধানের মুখে চোখ ফেলে হুংকার ছাড়লো তাসনিম। শিগগির বলে দাও, তোমরা কারা। কি করছো এখানে?

প্রধান বললো কিছুই করছিনা। শত্রুদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছি। তাসনিম বললো কিন্তু, তোমাদের সঙ্গে মহিলা ক্যানো! মনে তো হয় তোমরা কেউই মুসলমান নও। শত্রুরা কেউ কোনো কথা বলেনা। আবু হিশাম তাসনিমকে বললো– এসবের কাজ নয় ভাইয়া। মারের ওপর কোনো অষুধ নেই

তাসনিম ঠিকই বলেছো বলেই মেশিনগানের বাট দিয়ে প্রধানের ঘাড়ে আঘাত করলো। অন্য চারজনও আঘাত করতে লাগলো আরো ক'জন যুবকের গায়ে, যুবতীরা ভয়ে কেমন জড়ো সড়ো হয়ে কাঁপতে লাগলো। তবে তাদেরকে কেউ আঘাত করলো না।

মার খেতে খেতে শত্রুপ্রধান মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো, তাও সত্য কথাটি মুখ থেকে বেরুলো না তার। আবু হিশাম আরেকদফা হলরুম পরিদর্শন করতে লাগলো। দেখলো একপাশে দেয়ালে বড় একটা তাঁবু খুবই সুক্ষ্মভাবে টানানো

রয়েছে দেয়ালের রঙ আর তাঁবুর রঙ এক হওয়াতে সেটা যে তাঁবু তার কোনো পরিচয়ই রইলোনা।

আবু হিশাম দু হাতে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিতেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। আরো অগনিত গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস পাইপসহ বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্রও এখানে মজুদ আছে। সবচে বড় বিস্ময় আরেকটি সুরঙ্গ পথ পর্দার আড়াল থেকে চলে গেছে পবিত্র রওজা শরীফের দিকে।

আবু হিশাম দৌড়ে এসে শত্রুপক্ষের দিকে মেশিনগান তাক করে চিৎকার করে উঠলো- শিগগির বলে দাও, কেনো এত সরঞ্জাম, কেনো ওই সুড়ঙ্গ। নইলে তোমাদের সবাইকে এখনি ধুলো করে দেয়া হবে।

তাসনিম শত্রু প্রধানের পিঠের ওপর দু'হাতে টানা আঘাত করে গর্জে উঠলো– বল শয়তান বল! শত্রু প্রধান কাঁপা কাঁপা গলায় বললো– বলছি বীর, বলছি। তুমি আমাদেরকে প্রাণে মেরোনা। তাসনিম তার শার্টের কলার ধরে টেনে তুললো। মুখের ওপর ঝুকে পড়ে বললো– সব সত্য কথা বলেদে। শত্রু প্রধান অনুনয়ের ভঙিতে হাতজোড় বুঝিয়ে বললো– সত্যিই বলছি বীর। আমরা আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ইসরাইল থেকে এসেছি। এসব রাষ্ট্রের ইয়াহুদী ও খৃস্টানেরা দুর্ধর্ষ কিছু তরুণ তরুনী দিয়ে মুসলমানের নাশকতায় শক্তিশালী একটা টিম গঠন করেছে। আমি ওই টিমের কেন্দ্রীয় লোক। আমি ইয়াহুদী আমার সঙ্গে ইয়াহুদীর পাশাপাশি ওরা কজন অর্থডক্স খৃস্টানও রয়েছে।

তাসনিম বিস্ময় ঝেড়ে বললো- কিন্তু, তোমরা এখানে কি করছো?

শত্রু প্রধান বললো- সে কথাইতো বলছি বীর। সব সত্য কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা শুধু আমাদেরকে জানে মেরোনা। এখানে এ মিশন আমাদের দীর্ঘ দিনের। তিলে তিলে আমরা গড়ে তুলেছি এ আন্ডারগ্রাউন্ড রুম। ধীরে ধীরে এনেছি এখানে গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস পাইপ ইত্যাদি সরঞ্জামাদি।

তাসনিম অধীর হয়ে উঠলো- কিন্তু ক্যানো এনেছো এগুলো এখানে! শত্রু প্রধান বললো– হজ্জ মওসুমে তোমাদের মহানবীর রওজা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের জন্য।

তাসনিম টিম-এর মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, একসঙ্গে তারা এমনভাবে জ্বলে উঠলো, যেনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেলো। শত্রুদেরকে তারা মারলো খুব। তবে মহিলাদের কেউ কিছু বলছে না। নারী মায়ের জাত তাই তাদেরকে ছাড় দিয়ে যাচ্ছে তাসনিম। শত্রুপ্রধান

আবার বলতে লাগলো– আমাদের মিশন সাক্সেস হচ্ছিলো, আর নয় দশ ঘণ্টার ব্যবধানে আমরা শক্তিশালী বোমায় মসজিদে নববীর একাংশ উড়িয়ে দিতাম।

তাসনিম বললো– তবে তো তোদের আর রেহাই নেই শয়তান। তোরা এতই অবুঝ যে মহান আল্লাহ তাআলার মহা ক্ষমতা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নস, আল্লাহ কেন্দ্রিক বিষয়ের হেফাজত মহান আল্লাহ পাকই করে থাকেন।

তাসনিম আরো জোরে হুংকার ছাড়লো– তোদের শাস্তি এখানেই হবে না শয়তান, তোদের শাস্তি হবে জনসমক্ষে। চল সবাই, সাথীদের উদ্দেশ্যে চোখের ইশারা করলো তাসনিম। অমনি তারা আহত শত্রু দশজনের প্রতি অস্ত্র তাক করে তাদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো সুড়ঙ্গের বাইরে।

এদিকে নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া ততোক্ষণ ভাঙ্গা কৃত্রিম খেজুর গাছের গোড়ায় সুড়ঙ্গ পথের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর তারা সুড়ঙ্গের ভেতরে কিছু গোলাগুলির শব্দ এবং হাঁক ডাক শুনে আতঙ্কে চলে এসেছে বাগের বাইরে। গাড়ীতে সেইফ হয়ে তারা থানাসহ আরো ক'টি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোনে বিষয়টা পুরোপুরি জানিয়ে দিয়েছে।

খবর পেয়ে ইতোমধ্যে লোকারণ্য হয়ে গেছে খেজুর বাগ, ওয়াদি বাতহানের দুপাশ, পথ, ঘাট, মাঠ। এতলোকের ভিড়েও নুসাঈফা মেহরীন বান্ধবীকে নিয়ে রীতিমতো সুড়ঙ্গ পথের মুখেই হাজির রয়েছে। তার মন আর মানছেনা, প্রিয় মুখের মানুষটি কি বেঁচে আছে, না কি আল্লাহ না করুন একটা কিছু হয়ে গেছে তার। সেকি ফিরে আসবে, না-কি নুসাঈফা নিজেই নেমে যাবে সুড়ঙ্গ পথে।

এরিমধ্যে মেশিনগান হাতে নিয়ে মহাবীরের ভঙ্গিতে সুড়ঙ্গ পথ থেকে বেরিয়ে এলো তাসনিম। তার পেছন পেছন উঠে এলো শত্রু পক্ষের যুবক ছয়জন, তারপরে যুবতী চারজন এবং তার পেছনে আবু হিশাম, নকীব, মাখদুম ও দেলওয়ার।

অপরাধী দশজন যে যার হাত ওপরে তুলে তাদের পরাজয় বরণ উপস্থিত সবাইকে জানালো। তাসনিম সবার উদ্দেশে গলা ছেড়ে বললো, প্রিয় ধর্মপ্রাণ ভাই ও বোনেরা। এই মহা দুস্কৃতকারী জঘন্য হতভাগ্যের দশজন বেদ্বীন নারী পুরুষ আমাদের প্রিয় পাক নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মসজিদ ধ্বংসের উদ্দেশে দীর্ঘদিন ধরে মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। আশা রাখি আপনারা এদের এই ঘৃন্য অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক বিচার করবেন।

দৃষ্টান্তমূলক বিচার বলতে অপরাধীদের প্রাণদণ্ড ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। উপস্থিত মদীনাবাসী তাই এখন আশা করতে লাগলো।

সংক্ষিপ্ত মামলা ও শুনানীর পর সরকারী উদ্যোগে জনসমক্ষে ঘৃণ্য অপরাধীরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরি হবার পর তাসনিম টিম আরশ মোবারকের উদ্দেশ্যে হাততুলে মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো– আয় আল্লাহ আপনি মহান, সত্যিই আপনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী, দো জাহানের লালক-পালক, আপনার দোস্ত প্রিয় রাসূলের (সা.) মান আপনিই রেখেছেন। আর এ ক্ষেত্রে আমাদের মতো নগন্য ক্ষুদে বান্দাদেরকে আপনি এই ঘৃণ্য অপরাধ প্রতিহত করার তৌফিক দান করে চিরকৃতার্থ করেছেন। হে মহান, আপনার দরবারে লাখ লাখ শোকরিয়া।

এমন অবিস্মরণীয় একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করে তাসনিম টিম নুসাঈফাদের কাছে আরো অকল্পনীয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। তাসনিমের জন্য নুসাঈফার বুকের তলে লুকিয়ে থাকা সবটুকু ভালোবাসা উথলে উথলে উঠলো। আনমনে প্রত্যয়ী হলো। প্রয়োজনে মাতাপিতা ভ্রাতাঘরবাড়ী সব কিছু ত্যাগ করবো। তবু এই অনুপম দুর্লভ নায়কের পিছু কিছুতেই ছাড়বে না। তাসনিমকে চিরসাথী হিসেবে না পেলে নুসাঈফা বোধ হয় মরেই যাবে।

তাসনিম টিম ভাবলো, সৌদি সরকারের কাছে তারা যেনো ধরা না পড়ে যায়। ধরা পড়লে, তাদের মূল উদ্দেশ্য কর্মে হয়তো ব্যঘাত ঘটবে। তাদের এই ভালো কর্মের জন্য সৌদি সরকার যদিও তাদের পুরস্কৃত করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে তো আর এ দেশে থাকতে দিবেন না। কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে যেতেও দিবেন না, বরং সরাসরি ফেরত পাঠিয়ে দিবেন বাংলাদেশে। অবশ্যি এমন আইন সৌদি রাজ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই করে গিয়েছিলেন, হজ্জ করতে এসে হজ্জের পরে বাংলাদেশের কেউ যদি এ রাজ্যে বহিরাগত হিসেবে ঘোরাফেরা করে, যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তবে তাদেরকে থানা হাজত না করে সরকারী খরচে ফিরতি ফ্লাইটে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু, বাংলাদেশে ফিরে তো যাবেনা তাসনিম টিম। তারা যাবে আমেরিকায়, মুসলিম নিধন কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় স্থানে আক্রমণ চালাবে তারা।

সিদ্ধান্ত স্থির করে তাসনিম গা ঢাকা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাথীদেরকে চোখে ইশারা দিলো, ভিড়ের মধ্য থেকে সবার অলক্ষ্যে তারা বেরিয়ে এলো জাবালে সীলার পথে।

সবাইকে বোকা বানিয়ে তাসনিম টিম ভেগে আসতে পারলেও নুসাঈফাদের কাছে ধরা তাদের পড়তেই হলো। তেমনি আরেকজনের কাছে ধরা পড়লো, যার নাম, বনি আল কাসেদ। তিনি একজন মধ্যবয়সী মুজাহিদ কমাণ্ডার ইন্টান্যাশনাল ইসলামিক জিহাদের একনিষ্ঠ সদস্য তিনি, মদীনা মোনাওয়ারায় তিনি একাই কেবল বিরাজ করছেন না। তার একশো সদস্যের মুজাহিদদলও রয়েছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

এই পবিত্র নগরীতে কাসেদ টিমকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ইসলামিক মিশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর আমেরিকার গিরিকন্দর থেকে। উদ্দেশ্যে, তারা এই পবিত্র নগরীর পবিত্রতা রক্ষার্থে যেকোনো অপশক্তির মোকাবেলা যে কোনো মূহূর্তেই যেনো করতে পারে।

কাসেদ টিম এ নগরীতে অবস্থান করছে দীর্ঘদিন, কিন্তু আজোবধি কোনো উল্লেখিত মিশনে শামিল হওয়ার তৌফিক তাদের হয়নি। তারা যেমন একটা মিশনে অংশ নেয়ার তামান্নায় আকুল হয়ে ছিলো এতোদিন, ঠিক তেমন একটা মিশনে অংশগ্রহণ করে জয়ী হলো, মাত্র পাঁচজনের একটি দল। তাই সে দলটি বনি আল কাসেদের কাছে অতিশয় প্রিয় হয়ে উঠলো এবং তাদের এই বীরত্বের খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে রীতিমতো কেন্দ্রীয় দপ্তরে পৌঁছে দিলেন তিনি।

এর জবাবে ইসলামিক জিহাদ প্রধান খালিদ বিন আতাউল্লাহ আল কাসেদের কাছে বললেন– আল্লাহর পথের এই পাঁচ বীর সেনানীকে তোমরা কড়ানজরে রেখো এবং তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে সদা সজাগ থেকো, আর জেনো রেখো, মুসলিম নিধন মিশনের সদস্যরা তাদের পেছনে লেগে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তাদেরকে মেরে ফেলবে তারা। কিন্তু তাদেরকে হারিয়ে ফেললে চলবে না, এই পাঁচজন মুসলিম বীর যুবক আমাদেরকে প্রয়োজন।কাসেদ তার কাছে জানতে চেয়েছেন আমরা এখন কি করতে পারি, স্যার।

স্যার বললেন– এ্যানিহাউ, বীর ক'জনকে আমাদের আমেরিকার আস্তানায় প্রেরণ করা হোক। যা করার এখানেই করবো।

–ওকে স্যার। বলে কাসেদ ওয়ারলেস অফ করেছেন।

জাবালে সীলায় পৌঁছাবার আগেই তাসনিম টিমের কাছে ব্যাপারগুলো খুলে বললেন আল কাসেদ। তাসনিম চিন্তাযুক্ত হলো, ভাবলো, লোকটি শত্রুপক্ষের কেউ কি-না। ছদ্মবেশে তাদেরকে ঘায়েল করতে এসেছে কি-না।

সম্ভাব্য সবগুলো পরীক্ষা তাসনিম করে ফেললো। দেখলো, না, শত্রুতার কোনো আলামত লোকটির ভেতরে নেই। আর থাকলেও তার মোকাবেলা করার

মতো ক্ষমতা তাসনিম টিমের আছে। তাছাড়া তাসনিম এই ভেবে লোকটাকে মেনে নিয়েছে, তারাতো আমেরিকাতে যাওয়ারই ইচ্ছা করেছিলো, মহান আল্লাহ পাক হয়তো সেই ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত করে দিচ্ছেন।

আরোখানিক ইতস্ততঃ ভেবে তাসনিম আল কাসেদকে বললো–কিন্তু আমরা আমেরিকায় যাবো কি করে। কেউ যদি আমাদেরকে ধরে ফেলে?

কাসেদ অভয় দিয়ে বললেন– সে সব দায়িত্ব আমাদের। আপনারা কোনো ব্যাপারে দুর্বল হবেন না, সারা বিশ্বে আমাদের লোক যেভাবে বিচরণ করে, যাতায়াত করে আপনারাও সেভাবে যাতায়াত করবেন। কোনো সমস্যা নেই।

তাসনিম বললো- ওকে, আমরা রাজি। কাসেদ বললেন, থ্যাংক ইউ।

মার্কিন দূতাবাসে মুজাহিদদের নিযুক্ত এজেন্টদের সহায়তায় সব কাগজপত্র দ্রুত তৈরি হলে বিকেল চারটা কুড়ি মিনিটের ফ্লাইট জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লো, তাসনিম টিমকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইসলামিক জিহাদের অন্য পাঁচ সদস্য। কিন্তু, বড়োই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, নুসাঈফা মেহরীন এবং তামান্না সালওয়াও এই বিমানের প্যাসেঞ্জার হয়েছে। ওদের দু'জনেরই মাল্টিপল ভিসা আছে।

তিন.

আমেরিকার বুকে পা রেখেই তাসনিমের সমস্ত শরীরে একবার আনন্দ বেদনার দোলা লাগলো। এই তো সেই আমেরিকা যারা মুখে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, শিশু অধিকারের প্রবক্তা সাজলেও, মূলত তা লংঘন করে ভয়াল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বহাল থাকাই তাদের ধর্ম ও কর্ম। ইউরোপ, আমেরিকা মিলে সমগ্র বিশ্বকে করায়ত্ব করাই তাদের লক্ষ্য। মূলত এই আগ্রাসী পরিধারাটার জন্ম দিয়েছিলো বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি। সন্ত্রাস দমনের আখ্যা দিয়ে আমেরিকানদের ওপর দমন পীড়নের স্টীম রোলার চালিয়েছে তারা। এই কুখ্যাত বৃটিশরাই বাংলাদেশেও অন্যায় ভাবে ১৯০ বছর রাজত্ব করেছে। নীল চাষের ইতিহাস ভুলে যায়নি মানুষ। গরীব কৃষকের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে তারা সম্পদ জমা করেছে। তারা ফ্রান্সের সাথেও করেছে। বৃটিশ বংশোদ্ভুত এ্যাংলো আমেরিকান নামে পরিচিত দুবৃত্তরাই কৌশলে এ রাজ্যে প্রবেশ করে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। পুরুষানুক্রমে এদের অধিকাংশেরই রক্তে উপনিবেশিকতা, আগ্রাসন, হিংস্রতা-হিংসা, কূটকৌশল, অত্যাচার, জোর-জুলুম, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা। লুটতরাজ তথা পৈশাচিক নৃশংসতার বীজ তাদের মনে

স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছে। ১৭৮৩ সালে স্বয়ং জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি উদীয়মান সাম্রাজ্য।

আমেরিকো ভেসপুসি নামক পরিব্রাজক ১৪৯৭ সালে এই মহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন বলে তার নামানুসারে এর নাম হয় আমেরিকা। আর ৫০টি রাজ্য মিলে এখন যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আয়তন ৩৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৫৫ বর্গমাইল। বলা হয়, কলম্বাস ১৪৯২ সালে এ রাষ্ট্র আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের অধিবাসীরা প্রথমে এখানে বসতি স্থাপন করে। আমেরিকার আদিম অধিবাসিদেরকে রেড ইন্ডিয়ান নামেই অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এ রাষ্ট্রটিতে রেড ইন্ডিয়ানদের হার শতকরা ০.৫ শতাংশ। অবশ্য প্রকৃত সত্য এই যে, আরও হাজার বছর আগেই আরব মুসলমানেরা আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই এ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। এর রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম ওয়াশিংটন ডি.সি। এ ছাড়াও এদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য এলাকা রয়েছে যার নাম ডিষ্ট্রিক অব কলম্বিয়া। ওয়াশিংটন এখানেই অবস্থিত। এ দেশের খনিজ সম্পদ হলো, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, তামা, পারদ, স্বর্ণ, গন্ধক, চুনাপাথর আর কৃষিজাত দ্রব্য হলো– গম, তুলা, ধান, তামাক ইত্যাদি। তারা রপ্তানি করে থাকে ভারী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক ও বেসামরিক বিমান, ইস্পাত, লৌহ ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য। তারা আমদানী করে– ধাতু, কাগজ চিনি, রাবার, জ্বালানি তেল, পাটজাতদ্রব্য ইত্যাদি। আব্রাহম লিংকন এ দেশের দাস প্রথা রহিত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটন। তাদের কেন্দ্রীয় আইন সভার নাম কংগ্রেস। এ দেশে প্রতি চার বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। তাদের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনের নাম হোয়াইট হাউস। কিন্তু হাউজ হোয়াইট হলেও, কোনেকালেই এর ভেতরকার অন্তর হোয়াইট ছিল না। বলা হয়, ভয়াবহ ব্লাক এন্ড ডার্ক এ হাউসের বাসিন্দাদের হৃদয়-মন।

বিমানবন্দর থেকে তাদের গাড়ী ততোক্ষণে নিউ ইয়র্ক হোটেলের সামনে এসে থামলো। অবশ্যি এ হোটেলেই উঠতে যাচ্ছে না তারা। তারা চাচ্ছে মার্জিত কিছু। কিন্তু তাদেরকে গোপনে থাকতে হবে বলে এখানটা ছাড়া আপাততঃ আর উপায় নেই। এখানে তারা সাময়িক অবস্থানের পর সময়ের সুযোগে তারা ফিরে যাবে শহর থেকে ৩৬৫ কি.মি দূরে গিরিকন্দর এলাকা স্যাগভোনায়। ওটা জিহাদী জওয়ানদের এক অভয়াশ্রম।

হোটেলটা বারো তলা। তাসনিম টিম সিট পেলো সাততলায় ডান পাশের ৭০৩ নং রুমে। নুসাঈফা ও তামান্না সালওয়াও উঠেছে এ হোটেলে। তাদের সিটও সাত তলার বাম পাশে ৭০৭ নং রুমে। মাঝ খানের তিনটা রুমের দুটো খালি এবং একটাতে আমেরিকান উচ্ছৃংখল তরুণীরা আস্তানা গেড়েছে দীর্ঘদিন। তারা তাদের যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পছন্দসই পুরুষদের শিকার করে নিয়ে আসে এখানে। নেশায় বুদ্ হয়ে নোংরামীতে মেতে ওঠে তারা।

৭০৬ নং রুমের দরোজায় দাঁড়িয়ে স্বল্পবস্ত্রের মিথিলা দেখতে পেয়েছে বিশ্বাসী তেজোদীপ্ত মুজাহিদ তরুণ তাসনিমকে। তার হাতে ছুরি আর আপেল ছিলো। তাসনিমকে দেখে আপেল কাটতে গিয়ে সে তার হাত কেটে ফেলেছে। বাম হাতের তর্জনীতে বেশ খানিক দেবে গেছে ছুরি। রক্ত ঝরছে খুব। সে ঝরুক, রক্তের দিকে খেয়াল নেই মিথিলার, তার খেয়াল সেই এক পলকের একটু দেখার কল্প নায়কের চেহারায়। আনমনে সে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, যে করে হোক, এই নায়ককে তার করায়ত্ব করতে হবেই। ইতোমধ্যে ভেতর থেকে আরো একদল সঙ্গীনি এসে মিথিলাকে ঘিরে ধরেছে। জখমকৃত হাতকে সেবা যত্ন দিয়েছে। মিথিলা তাদের উদ্দেশে বললো– যেমন একজন নায়ককে খুঁজেছি সারাজীবন, আজ তার দেখা পেয়ে গেছি। কিন্তু, তার সঙ্গে আরো অনেক পুরুষ রয়েছে। এখন কি করি বলতো? র‍্যামন জবাব দিলো– ক'জন আর পুরুষ, আমরা সবাই মিলে ধরলে তারা উচ্চবাচ্য করতে পারবেনা। মিথিলা বললো– সবকিছু জোর জুলুম দিয়ে হয় না। তাকে আমি আপন করে পেতে চাই। ক্যাথী বললো– তাহলে ধৈর্য্য ধারণ করো। সময়ের ব্যবধানে আমরা তাকে বাগে আনতে পারবো। মিথিলা বললো কিন্তু, আমার যে মন মানছে না। এখনই পেতে ইচ্ছে করছে তাকে। র‍্যামন বললো- খুব যখন ইচ্ছে করছে, তখন চলনা সবাই, তাদের রুমে ঢুকে পড়ি।

– হ্যাঁ চল, বলে মিথিলা সঙ্গীনিদের নিয়ে ৭০৩ নং রুমের সামনে এগুতে যাবে তখনি লিফ্‌ট থেকে নেমে এলেন রবার্ট হুক, পিতাকে দেখতেই নিজের ভেতর ছোট একটা ধাক্কা খেলো মিথিলা। এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিলো। হাত তুলে বললো– হাই ড্যাড! ড্যাড বললেন– কাম অন।

সঙ্গীনিদেরকে অপেক্ষা করতে বলে পিতার কাছে এগিয়ে এসে পিতার কপালে একটা চুমু খেলো মিথিলা। কোট টাই পরিহিত পিতা তার পিঠের ওপর

হাত রেখে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন হাতে কি হয়েছে মাই সান। মিথিলা বললো, একটু কেটে গিয়েছে বাবা।

এগারো তলায় এসে রবার্ট হুক পকেট থেকে চাবি বের করে ১১৯৯ নং রুমটা খুলে ফেললেন। মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ঢোকার পর দরোজাটা ভেজিয়ে দিলেন তিনি। মিথিলা বেডের একপ্রান্তে বসে বললো কি ব্যাপার ড্যাড। মনে হয় গোপন কোনো আলাপ।

ড্যাড তার গা ঘেঁষে বসতে বসতে বললেন- বিষয় তো সবি গোপন। আবার সবি প্রকাশিত।

এরপর তিনি আদরের ভঙ্গিতে মিথিলার দেহের স্পর্শকাতর স্থান সমূহে হাত বুলাতে লাগলেন। মিথিলা বললো– এ কি হচ্ছে, ড্যাড!

ড্যাড বললেন- এ কিছুনা। জাস্ট এনজয়।

– কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে, তাকি ভুলে যাচ্ছো।

– মেয়ে বলেই তো পেতে চাই।

– কি পেতে চাও।

– তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডদের যা দাও, তাই।

– ড্যাড!

– চিৎকার করছো ক্যানো মাই সান। আমি তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করিনি? লেখা পড়া শিখাইনি।

– হ্যাঁ শিখিয়েছো, প্রতিটি বাবা-মারই তো তাই দায়িত্ব।

– কিন্তু, কোনো লাভ যদি না হয় তাহলে মানুষ দায়িত্ব পালন করবে ক্যানো! তোমার পেছনে যে আমি এত টাকা-পয়সা খরচ করি বিনিময়ে তুমি আমাকে কি দাও? তাই আমি বিনিময় পেতে চাই। আমিতো গাড়ীও কিনে দিয়েছি তোমাকে। গাড়ীর খরচও দিচ্ছি প্রতিদিন।

– কিন্তু ড্যাড!

– কোনো কিন্তু নয়, মাই সান! বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিমন্ডিত এই দেশে এমন ঘটনা তো ঘটে চলছে সচরাচর। তাইতো প্রথমেই বলেছি, গোপন আবার প্রকাশিত। আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি কোরো না, মাইসান, প্লিজ, কাম মাই হার্ট–

বলেই রবার্ট হুক মিথিলাকে জড়িয়ে ধরলেন। মিথিলা ভাবলো, সচরাচর যখন এমন ঘটনা ঘটে চলছে, তখন আর ড্যাডকে আমি ফিরিয়ে দেই কেন।

ঘন্টা খানেকের ব্যবধানে পিতার বাহু বন্ধন থেকে সঙ্গীনিদের মাঝে ফিরে এলো মিথিলা। সঙ্গীনিরা সবাই রুমেই ছিলো। মিথিলা জানতে চাইলো- নায়ক চলে গেছে, নাকি আছে?

র‍্যামন বললো- আছে তো অবশ্যই। এখনি তো চলে যেতে আসেনি।

- তোরা গিয়েছিলিস কেউ?

- না, যাইনি। তোকে রেখে কি করে যাই, বল?

- তবে চল সবাই, এখন যাই।

- হ্যাঁ চল।

প্রায় ন্যাংটা পুটো মেয়েগুলো একসঙ্গে বেরিয়ে এলো ৭০৩ নং রুমের সামনে। কলিংসুইচ টিপে দেবার আগে মিথিলা র‍্যামনের কাছে একবার জানতে চাইলো- প্রথমে তাদের কি বলা যেতে পারে?

র‍্যামন বললো- আমরা সেবিকার পরিচয় দিবো। নানান রকম সেবা দিতে থাকব।

মিথিলা 'ওকে' বলে কলিং বেলে টিপে দিলো।

পরপর চার পাঁচবার কলিংবেজে ওঠার পর ইসলামি জিহাদের যোগ্য সদস্য আহমাদ জানতে চাইলো- কে? মিথিলা বললো- সেবা লাগবে, সেবা, আমরা সেবা করে থাকি।

মুজাহিদ কুলের কান খাড়া হয়ে গেলো। তারা ভাবলো, কোনো অশনি সংকেত কি-না। আহমাদ বললো, না, আমাদের কোনো সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন নেই।

মিথিলা বললো- ওকে, কিন্তু দরোজাটা একটু খুলে দিন না প্লিজ, আমরা আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। আহমাদ বললো- আপনি সকালে আসুন। রাতে দরজা আর খোলা হবে না।

এমন কথা শুনে মেয়েগুলোর বুক পানি শূণ্য হয়ে গেলো। আরো খানিক অপেক্ষার পর রুমে ফিরে এসে একটি ব্লু ফিল্ম দেখতে লাগলো তারা।

নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া বেলেল্লা মেয়েগুলোর পুরো বিষয়টাই লক্ষ করছিলো। নুসাইফার ভেতরে ঈষৎ ঈর্ষাকাজ করে যাচ্ছে। ওই মেয়েগুলো তার তাসনিমকে ভাবছে কেন। আনমনে সে বলে উঠলো -না! না! তাসনিম আমার, শুধুই আমার।

তাসনিমও ভাবছে নুসাঈফা ও তামান্নার কথা, ভাবছে, সেই মেয়ে দুটোই এসেছিলো কি-না দরোজার ওপাশে, তবে তো দরোজা খুলে দেয়া উচিত ছিলো।

তাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিলো। জানা উচিত ছিলো তারা কি চায়, কেনো তারা জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে মক্কা -মদীনা হয়ে এই আমেরিকা পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করেছে। তারা কারা! কি তাদের বক্তব্য। এইসব না জেনে আর তাদের এভাবে এগুতে দেয়া ঠিক হবে না।

এই ভেবে তাসনিম আবু হিশামকে বললো– চলো, আমরা একটু বাইরে যাই।

আবু হিশাম বললো- কিন্তু, দরোজা খোলাটা কি ঠিক হবে!

– আরে এত ভয় কেনো! আমরা যেহেতু আল্লাহর নামে ঘর ছেড়েছি, আল্লাহই তো আমাদের রক্ষক। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের হেফাযত করবেন।

– ঠিক বলেছেন, ভাইয়া!

আবু হিশাম আহমাদকে দরোজা খুলে দিতে অনুরোধ করলো। আহমাদ দ্বিমত করতে পারলো না।

দরোজা খুলে দিতেই আবু হিশাম দেখলো, সেই আরবী মেয়ে দু'টো করিডোরের অপর মাথায় দাঁড়িয়ে রাতের নিউইয়র্ক দেখছে। তাসনিমকে ইশারা করলো হিশাম। তাসনিম বেরিয়ে এলে মেয়ে দুটো একদিকে ফিরে কী রকম কেঁপে উঠলো। তাসনিম আবু হিশামকে ইশারা দিয়ে মেয়ে দু'টোর কাছে এগিয়ে যেতে বললো। আবু হিশাম দেরি করলো না– এক্সিউজ মি, আমরা আপনাদের পরিচয়টা জানতে পারি কি!।

তামান্না প্রফুল্ল গলায় বলে উঠলো– ও শিওর। আসুন আমরা বসে কথা বলি, উনাকেও ডাকুন।

নুসাঈফা বললো- হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনাকেও ডাকুন।

এরি মধ্যে তাসনিম তাদের কাছে এসে পড়লো। তারা বসলো এসে ৭০৭ নং রুমে।

কথা শুরু করলো তাসনিম– হ্যাঁ, এবার বলুন, ক্যানো আপনারা আমাদের পিছু নিয়েছেন?

নুসাঈফা বললো- আপনারা আল্লাহর পথের সৈনিক, তাই।

– এটাই কি আপনাদের মূল কথা?

– হ্যাঁ জনাব, এটাই আমাদের মূলকথা।

– কিন্তু, আমাদের পিছু নিয়ে আপনাদের লাভ কি!

– লাভ ক্ষতি জানি না। তবে এটুকু জানি, আমরাও আল্লাহর পথের সৈনিক হতে চাই, আমরা আপনাদের কাজে অংশগ্রহণ করতে চাই।

– কিন্তু, এতে তো আপনাদের জীবনের নিশ্চয়তা থাকবে না।

– নিশ্চয়তা দেয়ার মালিক তো আল্লাহ। আপনারা যে বিশ্বাসে ঘর ছেড়েছেন, আমরাও সে বিশ্বাসে পথ চলতে চাই। তখনি তামান্না সালওয়া বলে উঠলো– হ্যাঁ জনাব, আমরা আপনাদের সহকর্মী হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই। আশা রাখি আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

হিশাম বললো– আপনারা যে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চান কিংবা আপনারা যে মুসলমান তারই বা কি প্রমাণ আছে ?

– প্রমাণ অবশ্যই আছে। বলে নুসাঈফা ভ্যানেটি ব্যাগ খুলে ভার্সিটিতে অধ্যয়নের কার্ড বের করে তাসন্নিমের হাতে দিলো, তামান্নাও তার কার্ডটা বের করে তুলে দিলো হিশামের হাতে।

কার্ড দেখে এবং আরো কথাবার্তা বলে তারা নিশ্চিত হলো মেয়ে দুটো শত্রুপক্ষের কেউ নয় এবং তাদেরকে সঙ্গে নেয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু, পুরুষের টিমে দু'টো মেয়ে মানুষকে নেয়া ঠিক হবে কি-না, তাই ভাবছে তাসনিম। ক্ষণিকের জন্য যদি কারো মনে এতটুকু কুবাসনা এসে যায়, তবে তো সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে তাদের। তাই তাসনিম বললো– আমার মনে হয় আপনারা বাবা-মা-র কোলে ফিরে গেলেই ভালো করবেন।

নুসাঈফা বললো, মার্জনা করবেন জনাব, আমরা কচি খুকী নই, তা ছাড়া বাবা-মা'র কোলে চিরদিনতো কেউ থাকে না। আমরা আপনাদের সাথেই থাকতে চাই, আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই, অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না।

তামান্না বললো– আমাদেরকে যদি ফিরিয়ে দেন; তবে আমরা দেশে তো ফিরে যাবোই না, বরং কোথায় যাবো, কি করবো তা-ও জানি না। আবু হিশাম বললো– আশ্চর্য! আপনাদের তো দেখছি সত্যিই কোন ভয়-ভীতি নেই। অদ্ভুত আরব নারী!

নুসাঈফা বললো– মরতে তো একদিন হবেই। এই যে পৃথিবীতে এতো মানুষ এসেছে কেউ কি বেঁচে থেকেছে চিরদিন। একশো বছর আগে যিনি ছিলেন, এখন তিনি নেই। এখন যিনি আছেন একশো বছর পরে তিনি থাকবেন না। পৃথিবীতে যদি কাউকে চিরদিন রাখা হতো, তবে তো সেই চিরস্থায়িত্ব লাভের সবচে বেশী হকদার ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর পরমবন্ধুকেই যখন

পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে তখন আর কে থাকতে পারবে এখানে। সবাই চলে যাবে। কিন্তু এই যাওয়াটাকে যদি স্মরণীয় করে রাখতে পারি, যদি আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করে শহীদ হতে পারি, তবে সে-ই তো উত্তম। অথচ, মোনাফেকরা তা বোঝেনা।

নুসাঈফার এত চমৎকার বক্তব্য শুনে তাসনিম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলো। এ যেনো তারই হৃদয়ের ভাষা, এ যেনো তারই বক্তব্য। আবু হিশাম নুসাঈফার মুখের দিকে না তাকিয়ে বললো- আপনি ঠিকই বলেছেন, হাদীসে আছে– "যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় না কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, না কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধের উপকরণ দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, আর না কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের খোঁজ-খবর নিয়েছে; তো আল্লাহ কেয়ামত আসার পূর্বেই তাকে এক ভীষণ আযাবে নিপতিত করবেন।" তাসনিম বললো– হ্যাঁ তাইতো। আরেক হাদীসে আছে- "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে না জিহাদ করেছে, আর না তার মনে জিহাদের প্রত্যাশা উদয় হয়েছে। তো সে এক প্রকার নিফাকের (মোনাফেকীর একটি শাখা) উপর মৃত্যু বরণ করলো।"

নুসাঈফা বললো- তাইতো। কিন্তু জিহাদের অর্থ সবাই জানে না। আবার শহীদী মরণের সৌভাগ্যও সবার আসে না। তাসনিম বুঝলো, এ মেয়ের জ্ঞানের পরিধি কম নয়।

তার স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড কথাবার্তা খুব পছন্দ হয়েছে তার।

আরো খানিক চিন্তা করার পর তাসনিম বললো– ঠিক আছে, আপনারা থাকুন এখন। আমরা যেতে আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

নুসাঈফা বললো– ধন্যবাদ।

তাসনিমরা তখন উঠে পড়লো।

তাসনিম ও আবু হিশাম ৭০৭নং রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই মিথিলা গ্রুপ তাদের প্রতি আক্রমণ চালালো। বারো চৌদ্দজন শেতাঙ্গ যুবতী টেনে হিঁচড়ে তাদের দু'জনকে রুমের ভেতর নিতে চাইলো। তারা উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়ে মানুষ হওয়ায় তাদেরকে আঘাতও করতে পারছে না। নুসাইফা ও তামান্না দৃশ্যটা দেখে বিষয়টা বুঝতে পারলো। বোরকার উপর কোমরে ওড়না বেঁধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো বেলেল্লা মেয়েদের ওপর। প্রথমে খুব মা'র খেলো দু'জন। পরে তাদের ক্যারাটের সাথে শত্রুরা আর পেরে উঠলো না।

তাদের এই অদম্য সাহস ও শক্তি দেখে তাসনিম বিস্মিত হলো। আরো বেশী বিস্মিত হলো এক ঝলত নুসাঈফার হূরাকৃতির মুখাবয়ব দেখে। তবে এ বিষয়টাকে খুব পাত্তা দিলো না তাসনিম। সে জানে ভালো লাগা থেকে জন্ম নেয় ভালোবাসা। কিন্তু, তার মানবীয় যতো ভালোবাসা তা তো কেবল শায়লাকে জুড়ে।

শায়লার কথা মনে পড়াতে তাসনিমের বুকের তল একবার কেমন করে উঠলো। মাকে মনে পড়লো তার। চটজলদি রুমে ফিরে এসে মা আর শায়লার এড্রেসে দু'টো ইমেল করে দিলো সে।

রাত গভীর হওয়ার আগেই তাসনিম টিমের গাড়ি গিরিকন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, একটা অত্যাধুনিক জিএমসি স্টেশন ওয়াগনে ড্রাইভার সহ তারা মোট তেরোজন, এই তেরোজনের মধ্যে নুসাঈফা আর তামান্নাও রয়েছে।

তাদের গাড়ীর পেছনে আরেকটা গাড়ী ধেয়ে আসছে। সে গাড়িতে মিথিলা, র‍্যামন ও ক্যাথীসহ তারা মোট ছয় জন। মিথিলার কথা হলো- হেরে যেতে রাজী নই। যে কোনো মূল্যে ওই প্রিয়দর্শন পুরুষটিকে আমি চাই-ই-চাই।

ভোর রাতের দিকে গাড়ি গিরিকন্দরের সীমান্নায় পৌঁছে গেলে তাসনিম পেছনের গাড়ির গতি লক্ষ্য করলো। দেখলো, কোয়ার্টার কিলো পেছনে রয়েছে ওদের গাড়ি। তাসনিম ড্রাইভারকে তাড়া দিয়ে বললো– জোরে টান নাও। ওরা যেনো আমাদের হদিস আর না পায়।

ড্রাইভার 'ওকে' বলে কথা মতো কাজ করলো।

মিথিলাদের চোখে সামনের গাড়িটা আর স্পষ্ট হলো না, তাই বলে তারা হাল ছাড়তে রাজী নয়। পথে পথে খুঁজে খুঁজে এগুতে লাগলো তারা। কিন্তু, তারা এমনই একটা গিরিপথে পৌঁছলো, যেখানে কেবল শ্বাপদসংকুল পরিবেশই নয় একদল দুষ্কৃতকারীও তাদের পথ আগলে ধরলো এবং তাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে অস্ত্রের মুখে নিয়ে চললো গোপন আস্তানায়।

তাসনিম টিম পেছন ফিরে ওই গাড়িটি না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ততোক্ষণে তারা পৌঁছে গেলো নিজ গন্তব্যের সীমানায়।

এই গিরিকন্দর এলাকায় কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এর একটা অংশ ইসলামিক জিহাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠেছে। বড় একটা কালো পাহাড়ের নীচে বিশাল এক আন্ডার গ্রাউন্ড টাউন তৈরি হয়েছে। যেখানে এক সঙ্গে সাত হাজার মুজাহিদ জিহাদী প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এর পাশেই রক্ষিত

আছে শক্তিশালী ঘোড়া, এ্যাসল্ট রাইফেল ও একে ৪৭ এর গুদাম। মেশিনগান থেকে শুরু করে, লাঞ্চার চালিত রকেট ও গ্রেনেড, বিভিন্ন মডেলের ট্যাঙ্ক, সৈন্যবহনকারী যান, স্কাউটকার, এমএম মাইন্টেনগান, টোউডগান, উৎক্ষেপক সিস্টেম বহুমুখী রকেট, স্বয়ংক্রিয় কামান, বিমান বিধ্বংসী কামান, এমএম মর্টার। এছাড়াও প্রযুক্তিগত ফোন-ফ্যাক্স-কম্পিউটার ইন্টারনেটসহ সেটেলাইট ফোন ও ব্রডকাস্টিং সেন্টার রয়েছে তাদের। আর রয়েছে এ আস্তানায় আসার পথে পথে মাইন পোতা। যেনো প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ছাড়া কেউ এ আস্তানার পথ খুঁজে পাওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়।

ইসলামিক জিহাদের বর্তমান প্রধান পরিচালক হাফেয মাওলানা খালিদ বিন আতাউল্লাহ একজন মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক, তিনি অত্যন্ত গভীর ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিশ্লেষণ, শক্তি ও রণ কৌশলে পরিপূর্ণ এক মহাবীর। তাঁর জন্ম হয়েছিলো বাঘের হুংকারের মুখে, উড়িষ্যার ঠাকুরাণী পাহাড়ের পাদদেশে, কারো নদীর গা ছোঁয়া কিরিগুরু জঙ্গলে। ছেলে বেলা থেকেই ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁর। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামী পুস্তক সাময়িকী পড়ে পড়ে কিশোর কালেই তাঁর অন্তর জিহাদের জজবায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সঠিক শিক্ষা তথা ধনে জ্ঞানে পরিপূর্ণ না হলে জিহাদে জয়লাভ যে সম্ভব নয়, তা ও তিনি অনুভব করেছিলেন পলে পলে। আজ তাইতো তিনি বিশ্বের সেরা সব ভার্সিটিতে কম বেশী লেখা পড়া করেছেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছেন। তিনি বাংলা, আরবী, উর্দ্দু, হিন্দি, ফার্সী, পশতুন, রাশিয়ান, আরাকানী ইত্যাদি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। তিনি যখন যেখানেই অবস্থান করেছেন, সেখানে থেকেই শুনেছেন মুসলিম বিশ্বের গগন বিদারী হাহাকার। তিনি দেখেছেন, জেনেছেন, বিশ্বের আনাচে কানাচে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যেখানেই মানুষ নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সেই নির্যাতিতরা সব মুসলমান। বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করে শান্তির পায়রা উড়িয়ে গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে, সেখানেই নেমে এসেছে নিস্পেষণের নিষ্ঠুর রোলার। কিন্ত আর কতোকাল আর কতো জনপদ ঘুমিয়ে থাকবে। শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো সমগ্র ইসলামী জাতি কতদিন আর গতিহীন হয়ে পড়ে থাকবে। মুসলমান কেন হারিয়ে ফেলবে তাদের জীবন-চেতনা। পঙ্গু হয়ে যাবে কেন তাদের আর্ন্তজাতিক চিন্তা কর্ম ক্ষমতা। এত

মার খেয়েও উঠে দাড়াঁবার, প্রতিরোধ গড়বার আয়োজন কেন করবে না মসলিম জাতি? এই কেনর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি নিজে একদিন এসে শামিল হলেন জিহাদের ময়দানে। যেখানেই মুসলিম পীড়ন, সেখানেই ছুটে যান তিনি। চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, আফগানিস্তান, আরাকান, ফিলিস্তিন সহ এমনি আরো কতো নিপীড়িত জাতির মাঝে জিহাদের বীনা ঝংকৃত করেছেন তিনি। মুখোমুখি কতো যুদ্ধে বাঘের মতো হুংকার ছেড়ে ছিনিয়ে এনেছেন জয়ের মালা। তাঁর এই অভূতপূর্ব পারঙ্গমতা দেখেই ইসলামিক জিহাদের বিশ্ব আমীর আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান আল ফারুক তাঁর হাতেই এর নির্বাহী দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন আরো বছর পাচেঁক পূর্বে। খালিদ বিন আতাউল্লাহ যোগ্যতার সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে এতদিনে সত্যিই একটা লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন। ইসলামিক জিহাদের হাজার হাজার সদস্য ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাদের সংখ্যা রাতদিন কেবল বাড়ছেই। কেবল যুদ্ধই তাদের কাজ নয়। সাধারণ মুসলমান এবং বির্ধমীদের নিকট ইসলামি রীতিনীতি ও আদর্শ পৌঁছে দেয়াও তাদের লক্ষ্য। তাদের দল শান্তির পক্ষে সব রকমের জিহাদেই অংশ নিয়ে থাকে। এক দেশে সদস্য, মুজাহিদ আরেক দেশের সংশ্লিষ্টকে চিনতে পারার জন্য তাদের নির্দিষ্ট সংকেত-ভাষা আছে। আর ইসলামিক জিহাদের সমস্ত সদস্যই উচ্চ শিক্ষিত, আরবী ও ইংরেজীতে পারদর্শী সাহসী নওজোয়ান। তাদের বক্তব্য একটাই– শৃগালের মতো জীবন চাইনা, পৃথিবীতে আল্লাহর সিস্টেম চাই। খুলে দিতে চাই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত। একদিন সমগ্র মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। সারা পৃথিবী জয় করতে চাই। আল্লাহর বিধান দিয়ে বিশ্বমানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। সপ্তমহাদেশের সীমানা মুছে এক পৃথিবী করতে চাই। তাওহীদ ও রিসালতের ভিত্তিতে বিশ্ব নেতৃত্ব আমরা মুসলমানেরা দিতে চাই।

এমন একটা সংগঠনের দৃষ্টান্ত দেখে, খালিদের মতো এমন একজন ইসলাম সেবকের সান্নিধ্য পেয়ে তাসনিম নিজেতে পুঙ্খানুপুঙ্খ পূর্ণতা পেয়ে গেলো। আজ তার মনে হচ্ছে, আর কোনো দিন কোন শত্রুপক্ষের কাছে তাদের হারতে হবে না। আর কোন অপশক্তি তাদের সত্যের ভিতে আঘাত হানতে পারবে না। এবার জয় হবে মুসলমানের, জয় হবে ইসলামের। জয় হবে আল্লাহর দ্বীনের।

খালিদ বিন আতাউল্লাহর পার্সোনাল রুমে বসে আছে তারা সাতজন। তাসনিম, আবু হিশাম, নকীব, দেলওয়ার, মাখদুম, নুসাঈফা ও তামান্না সালওয়া।

আরো কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তা বলার পর রাশভারী খালিদের মুখের দিকে চেয়ে তাসনিম জানতে চাইলো এত দেশ থাকতে ইসলামিক জিহাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি আপনারা এই আমেরিকাতেই গাড়লেন ক্যানো।

খালিদ মৃদু হেসে জবাব দিলেন শত্রুর বুকে বসেই শত্রুকে আমরা মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণীর অর্থ বুঝিয়ে দিতে চাই। আমরা চাই সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অবশ্যই মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করুক। আর মুসলমানের প্রধান শত্রুতো বর্তমানে আমেরিকাই। তার তল্পীবাহক, বৃটেন, রাশিয়া, ভারতকে নিয়ে সে-ই-করে যাচ্ছে এই গোটা বিশ্বকে উৎপীড়ন। তারই ইন্ধনে ইসরাইলের বরর্ব্বোচিত হামলা চলে ফিলিস্তিনে, কাফির বেদ্বীনের পদভারে নোংরা হয় রক্তাক্ত হয় আফগানিস্তান, ভারত চালায় সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস নিপীড়ন।

ভারত আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে কোন অমানবিকতাটা না চালাচ্ছে। মুসলমানের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছে, মসজিদে মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিচ্ছে। আগুনে পুড়িয়ে, জবাই করে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম মহিলাদের গণধর্ষণের পর আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিশুদের নির্মমভাবে খুন করা হচ্ছে। মহাপাপিস্ট দাজ্জাল জালেম গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভিয়েতনাম, আফ্রিকা, আরাকান, এরাই শুরু করেছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ। এক দিকে এক মর্দে মুমিন মহাবীর গাজী সালাউদ্দিন আরেক দিকে বৃটিশ রাজা রিচার্ডের মিত্র আটজন খৃস্টান রাজার সম্মিলিত বাহিনী। এই পৃথিবীতে নৃশংসতার সূচনা এরাই করেছে। ১৯৩৯ সালে হিটলারের পোলান্ড আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত। হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো ইতালি ও জাপান। অন্য পক্ষে ছিলো ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমেরিকা জাপানে গিয়ে দু'টো আনবিক বোমা ফেললো। হায় নাগাসাকি! হায় হিরোশিমা! খালিদ বিন আতাউল্লাহ আর বলতে পারলেন না। দু'চোখ ফেটে তার টস্ টস্ পানি করে ঝরে পড়লো। চোখ মুছে খালিদ আতাউল্লাহ ফের বলতে লাগলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি সংহতি স্থাপনের লক্ষে গঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশন্স। এই অবস্থার পরিবর্তন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয় জাতিসংঘ। কিছুকিছু ক্ষেত্রে সাফল্যার্জন করলেও মূলতঃ বহু ক্ষেত্রেই জাতিসংঘ বয়ে বেড়াচ্ছে

নিদারুন ব্যর্থতার আখ্যান। আসলে জাতিসংঘ একটা নামে মাত্র সংস্থা। আমাদের কাছে মনে হয়, এটা শিশুর হাতের মোয়া ছাড়া আর কিছু নয়। দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধে সংঘর্ষে মারা গেছে দুই কোটিরও বেশী লোক। এই চল্লিশ বছরে জানমালের যে বিনাশ ঘটেছে তার পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একক পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বের কাছে নিজেকে জাহির করেছে। তারাই না-কি পৃথিবীর তথাকথিত সর্বসেরা ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আমরা তা মানি না। আমরা বলতে চাই ইসলাম এই পৃথিবীতে একমাত্র পরাশক্তি। আজ আবার জেগে উঠেছে বিশ্ব মুসলিম। জালেম বাহিনীর মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছে আজ। আমরা সারা বিশ্বের, বিশেষ করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সীমান্ত খুলে দিয়ে সমগ্র মুসলিম জাতিকে একই প্লাটফর্মে দাড় করাতে চাই আজ। কিন্তু, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা চাই না অন্যায়ভাবে কোনো রক্তপাত। আমরা চাই শান্তি। চাই বিশ্বজুড়ে মানুষের কল্যাণে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে। চাই যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের যথোপোযুক্ত ব্যবহার তথা সম্মানজনক কর্মস্থানের ব্যবস্থা করতে, আয় ও সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করতে। সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা দিতে, চাই সমাজের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। তবুও আমাদের এই সমরাস্ত্রের আয়োজন এই জন্য যে, কেউ যদি আমাদের গায়ে পড়ে আঘাত করতে চায় তবে আমরাও তাকে ছেড়ে দেবোনা। বরং ওদের দম্ভকে বিচূর্ণ করে ছাড়বো।

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ সাহেব তাসনিম টিমকে নিয়ে একবার অস্ত্রাগারে এলেন। বিভিন্ন অস্ত্রাদির পাশে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু বোমাও দেখালেন। এর একটা বোমার শক্তি হিরোশিমায় ফেলা পরমানু বোমার চেয়ে বারো শো গুণ বেশী। মিসাইল দিয়ে এই বোমাগুলো বহুদূরের লক্ষ্য বস্তুতেও নিক্ষেপ করা যায়।

এছাড়াও তিনি দেখালেন, পারমানবিক বোমা বিকল করে দেয়ার কিছু সর ামাদি। যা দেখে তাসনিমের বুকের ছাতি চৌগুণ হয়ে গেলো। তার মনে হতে লাগলো সে-ই এই পৃথিবীর মহাবীর। তার মতো শক্তি এই পৃথিবীতে যেনো আর কারোরই নেই।

খালিদ বিন আতাউল্লাহর হাতে ধরা ওয়ারলেস সেটটা হঠাৎ বেজে উঠলো। এটা একটা মিনি ওয়ারলেস হলেও এর ক্ষমতা শক্তি সেটেলাইট পর্যন্ত। এর গায়ের ছোট গ্লাসে অপর পাশের টকম্যানকে দেখা যায়, মিনি সিডি রেকর্ড চালানো যায়।

কল রিসিভ করে খালিদ বিন আতাউল্লাহ জানতে চাইলেন-কি সমস্যা আবদুল মালেক?

আবদুল মালেক বললো- গোপন একটা আপরাধীচক্রের সন্ধান পেয়েছি ভাইয়া এবং তাদের আস্থানা আমাদের থেকে ৭৫০ মি. দূরে এই গিরিকন্দর এলাকাতেই। সেখানে একটি ইয়াহুদী গ্রুপ পাহাড়ের গুহায় বন্দি করে রেখেছে সাড়ে চারশত সুন্দরী যুবতী। যাদের বেশীর ভাগ ইয়াহুদী খৃস্টান। শোনা গেছে ক'জন মুসলমান মেয়েও না-কি রয়েছে সেখানে। এরা প্রায় সবাই সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলের অথবা পূর্ব ইউরোপের। মেয়েগুলোকে ওরা ইঙ্গ-মার্কিন এলিট শ্রেণীর মনোরঞ্জণে ব্যবহার করছে। মেয়েগুলো আকাশ আকাঙ্ক্ষী বন্দি পাখির মতো নিদারুন ছটফট করছে দীর্ঘদিন। কিন্তু তাদের মুক্তি দেয়ার কেউ নেই।

বিস্তারিত শুনে খালিদ আতাউল্লাহ বললেন -হু। তো সে জায়গার লোকেশান তোমার জানা আছে?

আবদুল মালেক বললো জ্বি ভাইয়া, আমরা সেখানকার সিডি ক্যাসেট করেছি। আর সেই ক্যাসেটটাই এখন আপনাকে দেখাতে চাই। আর একটা তথ্য জেনে নিন ভাইয়া, তাদের চীফের পার্সোনাল রুমে একটা স্যাটেলাইট কানেকশন দিয়ে এসেছি। খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন– ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার সেই সিডি চালাও।

– অবশ্যই ভাইয়া। বলে আবদুল মালেক সিডিটা মোবাইল ডেস্কে ইন করে অনসুইচ টিপে দিলো।

খালিদ আতাউল্লাহ দেখলেন, ঘটনা সত্য, কতোগুলো উলঙ্গ প্রায় স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিপীড়নের স্টিম রোলারে নিষ্পেসিত হচ্ছে। বিকৃত যৌনক্ষুধা মেটাতে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করা হচ্ছে তাদেরকে।

বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে তাসনিম খালিদ বিন আতাউল্লাহর মুখের দিকে চেয়ে বললো- আমি সেখানে যেতে চাই ভাইয়া, ওই অসহায় যুবতীদের আমি উদ্ধার করে আনতে চাই।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- কিন্তু, হুট করে সেখানে চলে গেলে তো নিশ্চিত রক্তপাত ঘটবে। ইসলামতো পারত পক্ষে হানাহানি থেকে বিরত থাকতে বলেছে এবং সব কাজের একটা সিস্টেম বাতলে দিয়েছে। আমরা সেই সিস্টেম অনুযায়ী কাজ করবো। আমরা প্রথমে প্রস্তাব দেবো ভালোয় ভালোয় যেনো তারা মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেয়। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করবো, তাদেরকে বোঝাবো, তারা যদি আমাদের কথা একান্ত না বোঝে তখন আমরা বিকল্প পথ অবলম্বন করবো। এরপর আতাউল্লাহ সাহেব অপরাধীচক্রের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে দু'জন দূত প্রেরণ করলেন, একজনের নাম তাহের আরেকজন মাহবুব।

চিঠিতে খালিদ বিন আতাউল্লাহ লিখেছেন-

আমরা অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য সংগ্রামী একটা প্লাটফর্ম। আমরা চাই, আল্লাহর এ জমিনের কোথাও যেনো কখনো জঘন্য পাপাচার অনুষ্ঠিত

না হয়। তোমাদের খবর আমরা সম্যক

অবগত হয়েছি। কিন্তু, আমরা রক্ত চাই না।

আমরা চাই মেয়েগুলোকে তোমরা সসম্মানে

নিজ নিজ দেশে পৌঁছে দাও। কিংবা আমাদের

কাছে হস্তান্তর করো।

চিঠি পড়ে বাল থ্যাচার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। কার এত বড় দুঃসাহস যে তাকে শাসিয়ে কথা বলে।

সিট ছেড়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো মধ্যবয়সী বাল থ্যাচার, পকেট থেকে লাইটার বের করে চিৎকার করে বললো- আমাকে ভয় দেখায়। ওর চিঠি আমি পুড়ে ফেললাম। সত্যিই থ্যাচার চিঠিতে আগুন ধরিয়ে দিলো। তা দেখে তাহের ও মাহবুব ঈষৎ শংকিত হলো। তারা ফিরে আসতে চাইলো কিন্তু পারলো না। বাল থ্যাচার অট্টহাসি হেসে দু'হাতে ইশারা দিতেই দু'পাশ থেকে দুই অস্ত্রধারী পাখির মতো গুলি করে ফেলেদিলো দু'জনের লাশ।

সেটেলাইটে দৃশ্যটা দেখে খালিদ বিন আতাউল্লাহ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কল করলেন তিনশত তেরোজনের সিনিয়র টিম।

তাসনিম আতাউল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বললো- আমরাও এই মিশনে অংশ নিতে চাই, ভাইয়া। আমরা আজই এই মিশনে অংশ নিতে চাই। আপনি শুধু অনুমতি দিন, প্লিজ।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ আরো খানিক চিন্তা করার পর বললেন- ঠিক আছে। তবে সাবধানে থেকো। আর মনে রেখো, পারতঃ পক্ষে রক্তপাত ঘটিও না। বোমা-গুলির বিকট শব্দ তুলো না। তাতে করে জায়গাটা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যাবে। সাংবাদিকরা রিপোর্ট ছাপবে। আর সে রিপোর্টের সূত্র ধরে মার্কিন সরকার এই পার্বত্যাঞ্চলে সেনা সদস্য নিয়োগ করবে। পথে পথে আমাদের মাইন পোতা রয়েছে, নিশ্চিত একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তখন আমাদের উঁচ পর্যায়ের বুযুর্গদেরও ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অল্পতেই আমরা ধরা দিতে চাচ্ছি না, তাসনিম ডানদিকে মাথা কাত করে বললো– ওকে।

– আপনি দোয়া করবেন ভাইয়া, এ অপারেশনে যেনো আমরা জয়লাভ করতে পারি। খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- ইনশাআল্লাহ। আর তারা যদি আপোষে সারেন্ডার করে তবে তাদেরকে না মেরে বরং সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

তাসনিম বললো, ওকে ভাইয়া।

এরপর তাসনিম সবাইকে নিয়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অপারেশনে রওয়ানা হলো।

বাল থ্যাচারের আস্তানাটা একটা জমকালো পাহাড়ের ভেতরে। বিশাল এ ভবনে প্রবেশের জন্য একটাই মাত্র পথ থাকলেও তিনশো বিশ সদস্যের তাসনিম টিম আরেকটা সুড়ঙ্গ পথ করেনিলো। একে একে সবাই সে সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ভবনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হুট করে এক একটা কামরায় দশ বারোজন করে ঢুকে পড়ে যাকে পেলো তাকেই হাত পা বেঁধে ফেলে রাখলো। এভাবে সবাইকে বেঁধে এক রুমে সবাইকে জড়ো করলো। তারপর যুবতীদেরকেও সে রুমে এনে এক পাশে রাখা হলো। হঠাৎই মেয়েদের ভেতর থেকে তাসনিমকে লক্ষ্য করে একটা মেয়ে ডেকে উঠলো হেই!

তাসনিম ফিরে দেখলো, সেই মেয়েটি, হোটেল নিউইর্য়কে যে মেয়েটি তাকে সবচে' বেশী বিরক্ত করেছিলো সে একাই নয়, তার সঙ্গের আরো চারজন মেয়েও রয়েছে এখানে। তাসনিমের বুঝতে আর বাকী থাকে না, এই অপরাধীচক্রের কবলেও তারা পড়েছে।

তাসনিম কোনো কথা বললোনা। না চিনতে পারার ভান করে চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো।

এরপর তাসনিম অস্ত্রহীন অসহায় হাত পা বাধা অপরাধী চক্রের দিকে চেয়ে হাতের মেশিনগানে ঝাঁকি দিয়ে ঝাঝালো কণ্ঠে বললো- ইচ্ছে করলে নিমিষেই তোমাদের সকলকে লাশে পরিণত করে দিতে পারি। কিন্তু, আমরাতো মানুষ,

মানুষ হয়ে মানুষের রক্তে কি করে স্নান করি। যদিও তোমরা মৃত্যুদণ্ডের অপরাধ করেছো, তবুও তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, যদি তোমরা তওবা করো। যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হও, যদি আমাদের কথা তোমরা মেনে চল।

বাল থ্যাচার নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললো কিন্তু, তোমরা তো ইসলাম ধর্মের লোক, তোমরাতো মুসলমান। তোমরা তো কট্টরপন্থী। আমরা তোমাদের সঙ্গী হতে যাবো ক্যানো! আমাদের ইয়াহুদী ধর্মইতো শ্রেষ্ঠধর্ম। আর মুসলমান মানেই তো সন্ত্রাসী।

তাসনিম বাল থ্যাচারের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো। বললো, আরে অবুঝ নাদান, ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই তোর। সন্ত্রাসের জন্ম তো দিয়েছিস এই তোরাই। তোরাই তো সৃষ্টি করেছিস এই পৃথিবীতে যতো পাপাচার, অনিয়ম। জেনে রাখ, তোরা তোদের পুরনো গ্রন্থকে পরিবর্তিত করে দেয়ায় যে মহাগ্রন্থ নাযিল হয়েছে সেই ঐশী আল কোরআনে ঘোষিত হয়েছে–

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, এবং আল্লাহ পাক যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবকে ভয় করে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরিভূত করে তাদের জন্য রয়েছে শুভপরিণাম।"

বাল থ্যাচার পাশে চিৎ হয়ে থাকা ফিদেল গেস্ট্রে বলে উঠলো। আরে আল্লাহ বলতেই তো কেউ নেই। কিসের আল্লাহ! কিসের শেষ বিচার। মানুষ মরে গেলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, এক সময়ে তার হাড়গোড়েরও অস্তিত্ব থাকে না। তার আবার শাস্তি কি!

তাসনিম বললো- আরে মুর্খমানব! আল্লাহ ঠিকই আছেন। কিন্তু, আল্লাহকে বোঝার মতো জ্ঞান তোদের নেই। পৃথিবীতে তোরা যে বড়ো অসহায়, তোরা না চিনিস মা, না চিনিস বোন, না বুঝিস নারীর ইজ্জতের মূল্য আর না বুঝিস পিতার মর্যাদা। কিন্তু, আল্লাহ যে আছেন, তার প্রমাণে এই পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত বিধর্মী বিজ্ঞানীও আল্লাহর অস্তিত্ব হাজির করেছেন। প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন কতোজন। খোদ তোদের এই আমেরিকার খৃস্টান বিজ্ঞানী যিনি চারজন নভোচারীর সঙ্গে প্রথম চাঁদে গিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মষ্ট্রং-ও চাঁদে যখন প্রথম পা রাখেন তখন তিনি তার কর্ণ কুহরে পবিত্র আযানের ধ্বনি শুনতে পান এবং

এই রহস্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমানে রূপান্তরিত হন। কিন্তু, তোদের এই নষ্ট দেশ দশ বছর পর্যন্ত সে কথা গোপন রেখেছিল। কিন্তু, সত্য কোনদিন গোপন থাকে না। সত্য তার নিজগুণে পাতাল ফুঁড়েও বেরিয়ে আসে।

বাল থ্যাচার বললো– তোমরা কি চাও?

তাসনিম বললো- আমরা চাই ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে।

গেস্ট্রে বললো- তোমরা কি আমেরিকা ইউরোপের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাও?

তাসনিম হেসে বললো- আমরা তোমাদের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করতে যাবো ক্যানো। এমন কি-ই-বা আছে তোমাদের শিক্ষায়। বরং তোমরা সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব তথ্য আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছো। মহাশূন্যে অভিযান, মৌলিক আবিষ্কারের তত্ত্ব সবতো মুসলমানেরই দান। বিশিষ্ট অংক বিজ্ঞানী জাবের ইবনে হাইয়ান থেকে অংক শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত নিয়েছো, ইবনে সিনা থেকে নিয়েছো চিকিৎসা শাস্ত্র। দর্শন বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয় ইবনে রুশদ, আল কিন্দি, আল খাওয়ারেজমী প্রমুখ থেকে নিয়েছো তোমরা। জনক্লার্ক রডপাথ বলেছেন- একমাত্র আরবরাই ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। গোস্তা বলিবান লিখেছেন- আরবীয়দের দৌলতেই ইউরোপীয়রা সভ্যতা ও আইন কানুন শিখেছে। সুতরাং তোমরা নিজেদের লোভ লালসায় মুসলমানের পেছনে অনেক ঘুরেছো, এখনও ঘুরছো। আর বিশ্বের যতো ব্রিলিয়ান্ট মুসলিম ছাত্র আছে, তোমরা টাকা দিয়ে তাদের কিনে নিচ্ছো। তোমাদের দেশে তাদেরকে নাগরিকত্ব দিচ্ছো। এরপরও কি বলবে, মুসলমান সন্ত্রাসী জাতি?

এ পর্যায়ে নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের উপর ইসলামী আদর্শের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে তাসনিম উপস্থিত সকলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালো। পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদীসের তেলাওয়াতে পরিবেশ পবিত্র মহিমায় সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। কক্ষে পিনপতন নীরবতা আর ঐশী প্রশান্তির স্বর্গীয় আবহ। এ পর্যায়ে বন্দিনীদের প্রায় সকলেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলো এবং সারাজীবন তাসনিমদের সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো। বাল থ্যাচার এবং ফিদেল গেস্ট্রের লোকজন ভাবলো, সত্যিই এত অনুপম রীতিনীতি যে ধর্মের, এত বীরত্ব যে ধর্মে, এত সত্য যে ধর্মে আমাদের তো সে ধর্মই অবলম্বন করা উচিত।

ক্রমশ ঃ তারা সবাই তাসনিমের প্রেমময় আচরণ ও উপস্থাপনার কাছে নতি স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেলো।

তাসনিম টিম বিধর্মী নারী পুরুষ সবাইকে ইসলামের কলেমা পড়িয়ে নিজেদের আস্তানার উদ্দেশ্যে নিয়ে চললো।

তাসনিমের পারঙ্গমতা দেখে খালেদ বিন আতাউল্লাহ বেশ অবাক হলেন। স্বীয় কাঁচা পাকা লম্বা চাপদাড়িতে ডান হাত বুলিয়ে বললেন- আলহামদু লিল্লাহ, আপাততঃ এরা আমাদের মেহমান হিসেবেই থাক। এরপর এদের যোগ্যতানুযায়ী এক একজনকে এক একদিকে সেট করে দেয়া হবে।

তাসনিম বললো- আপনি যা ভালো মনে করেন ভাইয়া, আপাতত নতুনদেরকে মেহমান খানায় নিয়ে যাওয়া হলো। তাসনিম টিম বাদে অন্যান্যরা সবাই চলে গেলো। এরই মধ্যে ফ্যাক্স লেটার নিয়ে শাহীন রেজা এসে খালিদ বিন আতাউল্লাহর সামনে দাঁড়ালো- বৃটেন থেকে এসেছে, স্যার।

দাও দেখি, বলে ফ্যাক্স লেটার হাতে নিয়ে খালিদ বিন আতাউল্লাহ দেখলেন লন্ডন থেকে তানজিদ লিখেছে-

প্রিয় নবী পাকের কল্পিত ছবি বিকৃতরূপে এঁকে, লিফলেট, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ছাপিয়ে লন্ডনের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াহুদীরা মিছিল সমাবেশ করছে। তারা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করছে। খালিদ বিন আতাউল্লাহ সাহেব তাসনিমকে দিয়ে চট জলদি একটা ফ্যাক্স লিখলেন–

কুকুর কামড়াবে, তাই বলে আমরাও যেনো চট করে তাদের কামড়ে না দেই। কিন্তু, আমাদের ধর্মীয় আকীদার উপর যারা এমন ঘৃণিত আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হয় না, আমরা তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারি না। তাহলে তো বিশ্বজুড়ে এদের সাহস কেবল বাড়তেই থাকবে। ওই ইবলিস শয়তানদের বিরুদ্ধে তোমরা সংগ্রাম করো, প্রয়োজনে তাদেরকে আঘাত করো এবং ভালো মন্দ খোঁজ খবর রীতিমতো আমাদের জানাও।

চিঠিটা শাহীন রেজার হাতে ধরিয়ে দিলেন্ন খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন, কম্পিউটার কম্পোজ করে বৃটেনে তানজিদের নামে প্রেরণ করো।

শাহীন রেজা বিদেয় হলো।

খানিকক্ষণের ব্যবধানে। খালিদ বিন আতাউল্লাহ সাহেবের মোবাইল সেট বেজে উঠলো।

সুইডেন থেকে কল করেছে খান মুহাম্মদ মঞ্জুর। খালিদ বিন আতাউল্লাহ জানতে চাইলেন ওখানে তোমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?

মঞ্জুর বললো না ভাইয়া, সমস্যা কিছুই নয়, তবে খবর হলো, আপনি হয়তো জানতে পেরেছেন যে, সুইডেন ও কানাডা পুরুষে পুরুষে কিংবা নারীতে নারীতে বিয়ের বিল পাশ করেছে এবং আমেরিকা সে বিলে সাপোর্ট দিয়েছে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- অবশ্যই, তা আমার অজানা নয়। ইবলিস শয়তানেরা আবার সেই অকথ্য ঘৃণ্য ব্যভিচারে মেতে উঠেছে। ওরা স্মরণ করছে না হযরত লুত (আ.) এর জাতির কথা। সমকামিতার অপরাধে মহান আল্লাহ পাক তাদের ওপর কী ভয়ঙ্কর গযব নাযিল করেছিলেন। মানুষ, পশুপাখি গাছ পালা সহ পুরো জমিনকে শূন্যে তুলে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমরা সে কথা তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করবো।

মঞ্জুর বললো- কিন্তু, বোঝাতে চাইলেই তো তারা আমাদের কথা মেনে ভালো হয়ে যাচ্ছেনা ভাইয়া, বরং তারা আরো আমাদের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। স্টক হোমে নাইটিংগেল কমিউনিটি সেন্টারে আজ বিকেল চারটা তিরিশ মিনিটে একসঙ্গে বিশজন পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন হবে অন্য বিশজন পুরুষের সঙ্গে। আমরা তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। তারা আমাদেরকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- তোমরাও তাদেরকে হত্যা করো, বোমা মেরে উড়িয়ে দাও ওই বিয়ের আসর।

মঞ্জুর বললো, ওকে ভাইয়া।

মোবাইল অফ করে খালিদ বিন আতাউল্লাহ সাহেব তাসনিমের মুখের দিকে চেয়ে বললেন- যাও, খাওয়া দাওয়া সেরে তোমরা বিশ্রাম নাও।

– থ্যাংক ইউ ভাইয়া। বলে তাসনিম তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে নিজেদের নির্ধারিত রুমে চলে এলো। নুসাইফা ও তামান্নাদের জন্য পাশেই আরেকটা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজেদের রুমে এসে বসলো নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া। নুসাঈফার পিঠে আধশোয়া হয়ে তামান্না বললো- জেদ্দায় বসে আমরা তো যে যার গার্জেনকে মোবাইল ফোনে জানিয়ে ছিলাম যে, আমরা ক'দিনের জন্য আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছি, কিন্তু, সেই ক'দিন যে কবে নাগাদ শেষ হবে তাতো আর জানিনা। নুসাঈফা বললো, জীবনেও শেষ হবে না।

– ভালোইতো, মন্দ কি! আমরা তো আজ নায়ক সাহেবের খুব কাছে কাছেই ছিলাম কিন্তু...

– কিন্তু কি তামান্না? বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নুসাঈফা জানতে চাইলো। তামান্না চাপা গলায় বললো–

– কিন্তু সই, আমিও বোধ হয় ধরা পড়ে গেলাম।

– যেমন।

– তুই বুঝিস না! মন কি তোর শুধু একারই আছে?

– ওহ্, বুঝেছি, তোর মনেও কাউকে বোধ হয় ধরেছে, তাই নয় কি?

– আবার বলে! প্রেমতো আসতেই পারে, পবিত্র প্রেম আছে বলেই তো পৃথিবী এত সুন্দর।

– তো নায়কটা কে শুনি, আমি কি তাকে চিনি নাকি, কখনো কি দেখেছি তাকে।

– অবশ্যই, সেতো আর কেউ নয় মেহরীন, তোর নায়কেরই একনিষ্ঠ সহকারী আবু হিশাম।

– বলিস কি! এই খবর! তো ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছিস, তো আমাকে এত দেরিতে জানালি ক্যানো!

–সবাই কি সব কথা হুট করে জানাতে পারে।

– তা অবশ্য ঠিক বলেছিস। তবে আমি কিন্তু খুব খুশী হয়েছি। ছেলে হিসেবে আবু হিশামও অমায়িক। ভালোইতো, আমরা দু'জন ওই দু'জনের জীবন সঙ্গীনি হতে পারলে তবে আর কি চাই, তাইনা তামান্না?

– তাই তো। বলে তামান্না গায়ে চাদর দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

– নুসাঈফা হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো- রাত অনেক হয়েছে। এশার নামায পড়ে তবেই ঘুমো।

– অবশ্যই।

দু'জন একসঙ্গে অজু বানাতে চলে গেলো।

মিথিলা কিন্তু ঘুম নিয়ে ভাবলোইনা। সে বসে বসে ভেবে যাচ্ছে তাসনিমকে নিয়ে। ছেলেটা দেখতে যেমন পৌরুষদীপ্ত, শক্তি-সাহসেও তেমনি মহাবীর। আর কতো পবিত্র ও সুন্দর তার আচরণ!

মিথিলার মন আর মানছেনা। ইচ্ছে হচ্ছে একবার ছুটে গিয়ে তাসনিমের মুখটা এক নজর দেখে আসতে, ওই মিষ্টি মুখের দু'চারটা কথা শুনতেও একান্ত আগ্রহ জাগছে তার। এমনি তোলপাড়ে আরো খানিক কাটাবার পর র‍্যামনকে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো তাসনিম টিমের উদ্দেশ্যে।

– আসতে পারি! দরোজায় দাঁড়িয়ে বললো মিথিলা।

তাসনিম সোফায় বসে বই পড়ছিলো। অন্যরা বেডে শুয়ে আছে। মুখ না তুলে তাসনিম বললো- হুঁ।

মিথিলা ও র‍্যামন ভেতরে ঢুকে পড়লো। দু'জন তাসনিমের দু'পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তাসানিম বললো- বলুন।

মিথিলা বললো– কি বলবো?

– কি বলবেন তাতো আপনারাই জানেন।

এরপর তাসনিম মুখ তুলে প্রথম তাকালো, বললো-ও, আপনারা, তো এতরাতে আবার ক্যানো এলেন!

মিথিলা বললো, এমনিতেই।

র‍্যামন বললো, ক্যানো! আসতে নেই বুঝি?

তাসনিম বললো- শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া কোনো যুবতীর কোনো যুবকের কাছে আস্তে নেই। তেমনি যুবকেরও যেতে নেই কোনো যুবতীর কাছে। তাতে পরস্পরের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে। ইসলাম নারীর জন্য যেমনি পর্দার বিধান করেছে, তেমনি বিধান পুরুষের জন্যও করেছে। পর্দা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয, আপনারা পর্দা সম্পর্কে জ্ঞান না রাখলেও আমরা কিন্তু পর্দা মেনেই চলি।

একটু থেমে তাসলিম আবার বললো- আশা করি কিছু বোঝাতে পারলাম।

মিথিলা বললো, অবশ্যই।

তাসনিম বললো- আসুন, লাইব্রেরী থেকে আপনাদেরকে কিছু বই নিয়ে দেই। যে বইগুলো পড়লে ইসলাম তথা নারীর মান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। হাতের বইটা বন্ধ করে তাসনিম মেয়ে দুটোকে নিয়ে ছুটে এলো কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে।

বিশাল হলরুম জুড়ে লাইব্রেরীতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে শুরু করে কম্পিউটার সিস্টেম-এ প্রায় উনিশ হাজার ইসলামী তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের কিতাব আছে, সেই সাথে আরো আছে নানা দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকা। খালিদ বিন আতাউল্লাহ জানেন, পৃথিবীতে যে-যা-ই হয়েছে, তা ওই বই পড়েই হয়েছে। যে যা ই করেছে বইয়ের জ্ঞান নিয়েই করেছে, আল্লাহর দান তো থাকেই, সে কথা ভিন্ন! বই যে পড়তে জানলো না, সত্য মিথ্যার মূল

ভেদাভেদ যে বুঝতে পারলো না, সে তো খুবই অসহায়, নিতান্তই করুণার পাত্র। পরম দয়ালু যদি তাদের দয়া করেন, তবে সে কথা ভিন্ন।

এইসব ভেবেই চিরদিন বইকে ভালো বেসেছেন খালিদ বিন আতাউল্লাহ আর তাই এই ইসলামিক জিহাদ মিশনের আস্তানায় উনিশটা বিষয়ের উনিশটা রুমের মধ্যে লাইব্রেরীটাও যুক্ত করেছেন সর্বাগ্রে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ দিন রাতের বেশীর ভাগ সময় এই লাইব্রেরীতেই কাটান। ফ্যাক্স, ফোনে, ইন্টারনেটে কাজ আসে, কাজ করেন, বই পড়েন। উল্লেখ্য, ছোট বড়ো প্রতিটা রুমেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সবক'টি ইলেক্ট্রনিকস সর ঞ্জাম চালু রয়েছে। আর প্রতিটা রুমের কম্পিউটারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সিস্টেম-এ প্যারালাল পোর্ট বসানো। এক রুমে বসে সব রুমের কম্পিউটারের তথ্য ট্রান্সফার করা যায়।

খালিদ বিন আতাউল্লাহকে সালাম ঠুকে লাইব্রেরীতে ঢুকলো তাসনিম। তার পেছন পেছন মিথিলা ও র‍্যামনও ঢুকলো। খালিদ বিন আতাউল্লাহর মুখের দিকে চেয়ে তাসনিম বললো- এদেরকে কিছু বই দিতে চাই এখান থেকে, যা পড়ে তারা পরিপূর্ণ মুসলিম হতে পারবে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন– ধন্যবাদ, এসব ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সেচতন থাকা চাই। যে যে বই প্রয়োজন ওদেরকে দাও।

আপনাকে ধন্যবাদ ভাইয়া বলে তাসনিম পাশের শেল্‌ফ থেকে সাধারণ ইসলাম শিক্ষা, ইসলামী জ্ঞানকোষ, পর্দা, নারী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব, আদর্শ নারী শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু ইংরেজী বই বের করে এনে মিথিলার হাতে তুলে দিলো। মিথিলার ভেতরটা আনন্দে ডগমগ করে উঠলো। তাসনিম বললো- যেহেতু আপনারা মুসলমান হয়েছেন, সেহেতু আপনাদের নামেরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। এমন নাম রাখা উচিত যে নাম উচ্চারিত হলেই বোঝা যাবে, নামের মানুষটি একজন মুসলমান।

মিথিলা বললো- এ সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বরং আমরা তা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

তখনি কথার রেশ ধরলেন খালিদ বিন আতাউল্লাহ সাহেব, এরা দু'জনেই তো নওমুসলিম, তাই না? তাসলিম বললো- জ্বি ভাইয়া, তাই।

আতাউল্লাহ বললেন- আমি এদের দুজনের দুটি নাম রেখে দিচ্ছি।

এরপর তিনি মিথিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন-এর নাম দিলাম 'নাসিমা', অর্থ, ভোরের পবিত্র বাতাস। আর ওর নাম দিলাম 'ফাহিমা' অর্থ, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী।

মিথিলা বললো- আমরা এ নামে খুশী আছি, ভাইয়া। খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- আলহামদু লিল্লাহ। তোমরা এখন যাও, কোনো কিছু প্রয়োজন হলে তোমাদের মহিলা কেয়ারটেকারকে জানিও, আর কেয়ারটেকারের মতের বাইরে কিছু কোরোনা।

মিথিলা ও র‍্যামন সমস্বরে আচ্ছা, বলে এক সঙ্গে রুম ছেড়ে বেরুলো।

তাসনিমের মুখের দিকে তাকিয়ে খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন,

-বোসো।

তাসনিম মুখোমুখি সোফায় আরাম করে বসার পর বললো- আমেরিকায় সাধারণ মুসলমানের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই, ভাইয়া।

আতাউল্লাহ বললেন– অবশ্যই। আমেরিকায় সাধারণ মুসলমান অবশ্য ভালো নেই, জগতের প্রধান শত্রু ইয়াহুদীর করালগ্রাসে মুসলমান এদেশে বড়ই অসহায়ত্বের দিন কাটাচ্ছে। হিজাব নিকাব পরিহিত মুসলিম মা-বোনেরা রাস্তা ঘাটে চলতে গিয়ে রোমিওদের অশালীন উক্তি আর টিটকারীর শিকার হয়। মুসলমান কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদেরকে যাচ্ছেতাই অজুহাতে নানান রকম হেনস্তা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ী মুসলমানরাও ঘোর বিপাকে দিন কাটাচ্ছে। সরকারী লোকজন এসে যখন তখন তাদেরকে চার্জ করে বসে– কতো টাকার পুঁজি, কতো টাকা লাভ হয়, টাকাগুলো করো কি, বিভিন্ন বেহুদা প্যাচালে তাদের পেরেশানীতে রাখে। পেরেশান হতে হতে তথা পেরেশান হওয়ায় ভয়ে কতো মুসলমান ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা রীতিমতো গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। মসজিদ বন্ধেরও পাঁয়তারা চলছে এ দেশে। ১৯৮৩ সালে সৌদী বাদশাহ ফয়সাল কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানে নির্মিত কিছু মসজিদ বন্ধ করে দেবার নির্দেশও ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ আরো কিছু বলতে চাইলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে তাসনিম বলে উঠলো মসজিদ তো আল্লাহর ঘর। এই আসমান ও জমিনের মালিক যে আল্লাহর সেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ঘর যারা বন্ধ করে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তো আমাদের এখনই একটা কিছু করা উচিত ভাইয়া।

আতাউল্লাহ বললেন বিষয়টা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম, একটু থেমে তিনি বললেন- একটা কাজ করলে কেমন হয় তাসনিম?

– কি কাজ ভাইয়া।

– আমরা নিউইয়র্কে একটা প্রোগ্রাম করি। আমেরিকায় কট্টর মুসলিম বিদ্বেষ তথা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, গুজরাট, আফগান, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভোসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে, ইরাক বিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে এক মহা সমাবেশের ডাক দেই।

তাসনিম বললো- খুবই ভালো উদ্যোগ, ভাইয়া। এমন কিছু করলে তো ইসলাম সম্পর্কে গণ সচেতনতা বাড়বে। ফল ভালো হবে।

– ফল তো ভালো হবে, কিন্তু করাটাও তো রিস্কি। শয়তানরা অতর্কিত ভাবে হামলা করে বসতে পারে।

– সে জন্য আমরা তৈরি থাকবো, ভাইয়া। ইনশাআল্লাহ ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

– তাইতো, আল্লাহর মর্জি না হয়, তবে আর আমাদের ক্ষতি কে করতে পারে।

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত নেতৃবৃন্দদের নিয়ে জরুরী বৈঠকে বসলেন এবং এই বৈঠকে সর্ব সম্মতিক্রমে আগামী এগারোই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে আন্তর্জাতিক মুসলিম পীড়নের বিরুদ্ধে এক কনভেনশনের নথিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। ফোন ফ্যাক্স ইমেল-এ আমেরিকা তথা বর্হিবিশ্বের সমর্থকদের মাঝে দাওয়াত কাজ চলতে লাগলো।

এগারো সেপ্টেম্বরের আগের রাতে তাসনিম তার টিম নিয়ে চলে গেছে ফিল্ড-এ। আমেরিকার অহংকার টুইন টাওয়ারের কাছের এক হোটেলের বলরুমে কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। তবে এখনো কাউকে জানানো হয়নি এটা কারা সাজিয়েছে কেনো সাজিয়েছে। অনেক কাউন্সিলর এসে নিউইয়র্ক সহ আশপাশের কয়েকটি শহরে অবস্থান করছেন। সকাল দশটায় তাদের প্রোগ্রাম। যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে যাবার মতো আয়োজন সবাই করে রেখেছে।

সুবহে সাদেকের পর থেকেই আহূতরা আসতে শুরু করেছে নিউইয়র্কের গন্তব্যে। সকাল পৌনে নয়টার পরে তাসনিম একবার কল করলো খালিদ বিন আতাউল্লাহর নাম্বারে– সব কিছুই ঠিকই আছে ভাইয়া। আপনি কি আসবেন এখানে?

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন– আসবো তো অবশ্যই, তবে আমি কখন আসবো কোথায় থাকবো তা কেউ জানবে না।

– ওকে, ভাইয়া। বলে তাসনিম মোবাইল ফোন অফ করে পকেটে পুরে রাখলো। এরই খানিকক্ষণের ব্যবধানে আকস্মিক একটা বিমান আকাশচুম্বী ১১০ তলা বিশিষ্ট টুইন টাওয়ারের একটাতে আঘাত হানলো। মনে হলো পুরো আমেরিকা যেনো বিশাল টুইন টাওয়ারের কম্পনে কেঁপে উঠলো।।

আগুন ধরে গেলো এবং ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো।

টাওয়ারের আশপাশের লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্যস্ত সমস্ত হায় হুতাশে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ছুটে গেলো তাসনিম টিমও।

পরক্ষণেই ঘটনাস্থলে শত শত পুলিশ ও উদ্ধারকর্মী এসে উদ্ধার কর্ম শুরু করে দিলো, এর ১৬ মিনিটের ব্যবধানে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দ্বিতীয় টাওয়ারটাতে আরেকটা বিমান একই রূপে আঘাত হানলো, এটাতেও একই ঘটনা ঘটলো এবং টাওয়ার দু'টি বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলো। বহু উদ্ধারকর্মী ও পুলিশও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চাপা পড়ে গেলো। ভবনে কর্মরত বহু মানুষ মারা গেলো। ছিনতাইকৃত বিমানের যাত্রীরাও নিহত হলো। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো কয়েক হাজার। তৃতীয় আরেকটা আত্মঘাতী বিমান ওয়াশিংটন শহরের দিকে ছুটে গেলো হোয়াইট হাউজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। অপর একটি বিমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা হেড কোয়ার্টার পেন্টাগনে আঘাত হানলো, ফলে ভবনটার একাংশ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং আটশতাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী প্রাণ হারালো। আর শেষ বিমানটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেনিসিলভানিয়ার দিকে ছুটে গেলো এবং সেখানে বিধ্বস্ত হলো।

তাসনিম গিরিকন্দরে পৌঁছাবার আগে বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ার এলাকায় আরেকবার বিচরণ করলো। দেখলো, টাওয়ার গুলি ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। স্তূপীকৃত বালু ও কংক্রিটের রাশি, লোহার দুমড়ানো টুকরো, কাঠামো আর চাপা পড়া মানুষের ছিন্ন ভিন্ন দেহাবশেষ, উদ্ধারকর্মীদের তৎপরতা আর কিছু মানুষের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

তাসনিম মোবাইল ফোনে খালিদ বিন আতাউল্লাহকে সব খবর জানিয়ে দিলো। বিস্তারিত শুনে তিনি বললেন– আলহামদু লিল্লাহ। আমরা অখুশী নই। আল্লাহ ফেরাউন ও কারুণের অহংকারে আঘাত হেনেছেন। আমেরিকার এমন কিছু স্থানে হামলা চালানো হয়েছে, যা দিয়ে আমেরিকা সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক ও

সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। অর্থাৎ এ হামলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই জুলুমবাজী বিশ্ববাসী আর চায় না।

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ একটু থেমে বললেন– শোনো তাসনিম, আমাদের প্রোগ্রামতো বানচাল হয়ে গেলো। তোমরা আর খোলামেলা ঘোরাঘুরি করো না। চলে এসো আস্তানায়।

তাসনিম বললো- ওকে ভাইয়া।

টাওয়ার ধ্বংস হওয়ায় বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত পরাশক্তি ও বিশ্বমোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ভয়ঙ্করভাবে গর্জে উঠলো। যুক্তরাষ্ট্র তার ভাষায় এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নায়করূপে সউদী আরবের নাগরিক তথা সে দেশ থেকে ইসলামী জিহাদের অপরাধে বহিস্কৃত মুসলিম বীর শায়খ ওসামা বিন লাদেনের নাম ঘোষণা করলো এবং বিন লাদেনের বর্তমান অবস্থান আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসনকে বিচারের জন্য তাকে তাদের হাতে সোপর্দ করতে বলা হলো। কিন্তু, ওসামা বিন লাদেনের কাছে ইসলাম প্রশ্নে তালেবান প্রশাসন নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ থাকায় তাকে ওই জঘন্য অত্যাচারীদের হাতে সোপর্দ করতে সম্মত হলো না তারা। ফলে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে মহা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। এক লাদেনকে ধরার অজুহাতে একের পর এক ধ্বংস করতে লাগলো মুসলিম জনপদ, নির্মমভাবে নিহত হতে লাগলো কতো শতো মুসলিম জনগোষ্ঠী, দুধের শিশুটিও তাদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পেলো না। কতো শিশুর হাত-পা উড়ে গেলো, শরীর ক্ষত বিক্ষত হলো, যুক্তরাষ্ট্র ধর্ম ও মানবতার কোনো দোহাই-ই মানলো না। অতএব তাদের একান্ত দোসর বৃটেনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জঘন্য সন্ত্রাস অব্যাহত রইলো।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জাহান আজ বারুদের মতো তেতে উঠেছে। দেশে দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং, সভা সেমিনার চলতে লাগলো। বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ চলতে লাগলো। খোদ আমেরিকাতেও এর রেশ ছড়িয়ে পড়লো। অসংখ্য ইয়াহুদী খৃস্টান স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। সবধর্মের মানুষের মাঝে একটি কথাই জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো- ইসলামই সত্য, আগামী দিনের পৃথিবী ইসলামেরই।

নিউইয়র্কের ক্যাথরিন ক্যাডেট হাইস্কুল। স্কুলটা ত্রিতল। হ্যারি দশম শ্রেণীর ছাত্র। টাওয়ার ধ্বংসের পর অন্যান্য আরো লক্ষ কোটি ইয়াহুদী -খৃস্টানের মতো এক বিশাল প্রশ্ন হ্যারির বুকেও জমে আছে।

ছাত্র হিসেবে হ্যারি এ-ক্লাশ। তাদের ক্লাশে মোট ছিয়াশিজন শিক্ষার্থী। হ্যারির সিট প্রথম সারিতেই নির্ধারিত। আজ বিজ্ঞানের স্যার টমাস লুই ক্লাশে আসতেই হ্যারি তার কাছে প্রশ্ন করে বসলো- আচ্ছা স্যার, আমাদের দেশ এই যে লাদেন লাদেন করে আদাজল খেয়ে নেমেছে, আসলে স্যার আমি জানতে চাই, লাদেনটা কি?

স্যার বললেন– তোমার প্রশ্ন শুনে আমার হাসতে ইচ্ছে হয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জেনে গেলো, লাদেন এক মহা সন্ত্রাসী মানব আর তুমি ক্লাশ টেনের ছাত্র হয়েও লাদেন বোঝোনা।

রাসেল বললো– লাদেন আমি ঠিকই বুঝি, স্যার। কিন্তু, আমি এটা বুঝিনা যে, লাদেনকে ক্যানো সন্ত্রাসী বলা হয়! সন্ত্রাসের এমন কি তিনি করেছেন।

– ক্যানো! এগারোই সেপ্টেম্বর আমাদের গর্ব টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগন ভবনে হামলা চালিয়ে সে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছে, এরপর আর কি বুঝতে চাও তুমি?

– কিন্তু স্যার, লাদেনই যে টুইন টাওয়ারে হামলা করেছেন এর কোনো প্রমাণ তো কেউ হাজির করতে পারেনি এখনও। তিনি তো কেবল সন্দেহভাজন ব্যক্তি। আমার কি মনে হয় জানেন স্যার, আমার মনে হয় আমাদের দেশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই মুসলমানদের ওপর আঘাত করার পথ বের করেছে। তা না হলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে আমাদের দেশ পৃথিবীর সর্বসেরা দেশ হওয়া সত্ত্বেও, টুইন টাওয়ারে হামলাকারী তথা হামলার কারণ তদন্ত করে সঠিক তথ্য কেন বের করতে পারলো না। অহেতুক সন্দেহ প্রবণ হয়ে একটা নিরীহ মুসলিম জাতির ওপর অকথ্য হামলা চালানো হচ্ছে। একটা দেশকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

স্যার বললেন– হামলা লাদেনই করেছে।

হ্যারি বললো– মানলাম স্যার, হামলা লাদেনই করেছেন, কিন্তু স্যার সেই লাদেনকে আমাদের এতবড় দেশ ক্যানো খুঁজে বের করে আনতে পারছে না। এক লাদেনকে ধরতে গিয়ে আফগানিস্তানের লাখো লাখো নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে তাদের ঘর-বাড়ি, ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে বৃহত্তর জনপদ, কিন্তু, লাদেনের 'এল' টাকেওতো আবিষ্কার করতে পারলো না। বিন লাদেনের এত কী শক্তি, স্যার। লাদেন যদিও টুইন টাওয়ারে হামলা করেননি। কিন্তু এই হামলাকে তো তিনি সাপোর্ট করেছেন। আমাদের দেশকে তিনি জালিম, খুনী, বর্বর হিসেবে ঘোষণা

করেছেন। তার কথার রেশ ধরে আরো কতো দেশ আমাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছে। কিন্তু লাদেন কিসের জোরে এত বলিয়ান, স্যার। আমাদের মতো পরাশক্তি একটা রাষ্ট্রকে পদধুলি জ্ঞান করে সবাইকে বোকা বানিয়ে কিভাবে বেঁচে আছেন তিনি এই পৃথিবীতে। তাঁর খুঁটির জোর কোথায় স্যার? হ্যারির এমন প্রশ্নে স্যার কেমন আমতা আমতা করতে লাগলেন। হ্যারি আবার বললো- কি সেই খুঁটি আমি তাই জানতে চাই, স্যার, বলুন স্যার?

স্যার কেবল থত মত খাচ্ছেন। কি বলে বা কী দিয়ে কি জবাব দিবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। এই প্রশ্নের হিসেব যে আজ তিনি নিজেও মেলাতে পারছেন না। বড়োই হিমশিম খাচ্ছেন তিনি।

হ্যারি আবার বললো- আমাদের এই বিশ্বখ্যাত শক্তি সামর্থের চেয়ে যদি বিন লাদেনের ওই খুঁটির জোর বেশী হয়ে থাকে, তবে আমিও সেই খুঁটিই আঁকড়ে ধরতে চাই, স্যার। স্যার, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

তখনি তার ডান-বাম এবং পেছন থেকে বেশ ক'জন ছাত্র-ছাত্রী সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বললো- হ্যাঁ স্যার, আমিও চাই। আমরা সবাই চাই...

স্যার পড়লেন মহা মুশকিলে। আরো খানিক ইতস্ততঃ ভাববার পর তিনি ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। হ্যারি স্প্রিং-এর বাঘের মতো লাফ মেরে স্যারকে টেনে ধরে বললো- আমাদেরকে মিট করে যান, স্যার। আমাদেরকে মুসলমান হয়ে যাবার পথ বাতলে দিয়ে যান, স্যার! আর তা না পারলে আপনি আমাদের কেমন শিক্ষক। জবাব দিন স্যার মার্কিন শ্বাসকদের বর্বর পলিসির জন্য ক্যানো আমরা আজ কলঙ্কিত সমাজের মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবো! ক্যানো স্যার, ক্যানো?...

কিন্তু, স্যারের মুখে আর কোনো জবাবই রইলো না। শিক্ষার্থীদের কাছে হেরে গিয়ে তিনি নিজেও অবশেষে বললেন- আমিও মুসলমান হতে চাই। অতএব, তোমরা আর চিন্তা কোরো না। তখনি ক্লাশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ছুটে এসে আবেগাপ্লুত হয়ে স্যারের গা ছুঁয়ে আন্তরিক শুভেচ্ছা এঁকে দিলো। এরিমধ্যে তারা মোবাইল ফোনে কথা বলে নিলো স্কুলের পাশ্ববর্তী ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানীর ড্রাইভাইর বাংলাদেশী ভাই আবদুল মতিনের সাথে। তিনি এদের আগামীকাল শুক্রবার জামে মসজিদে নিয়ে যাবেন, জুমার পর হবে ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠান।

ডিক ফুলারের অন্তরেও হ্যারির মতো প্রশ্ন সঞ্চারিত হয়েছে। ডিকের বয়স চৌদ্দ কি পনেরো বছর। তার কিশোর অন্তরে বিন লাদেনের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি

হয়েছে। টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগণ ভবন ধ্বংসের উৎসাহে সে-ও এদেশে এমনি উল্লেখযোগ্য কিছু একটা করতে চায়।

বন্ধুদের থেকে অনেকটা ভিন্ন গোছের ডিক ফুলার স্বভাবে বেশ শান্ত শিষ্ট হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার। আজ তার বুকেও মিথ্যের ভিত গুড়িয়ে দেয়ার প্রেরণা জেগেছে। আরো ছোটো বয়স থেকেই বিমানের পাইলট হবার প্রতি দারুন এক ঝোঁক কাজ করছিলো ডিকের হৃদয়নিভৃতে। এ যাবত বাবা-ভাইয়ের সঙ্গে যতোবার বিমানে চড়েছে, ততোবারই মনে হয়েছে, এর পাইলট যদি সে নিজেই হতে পারতো, তবে কতোইনা মজা হতো। অবশ্যি এই মনে হওয়া নিয়েই বসে থাকেনি ডিক। যথাসাধ্য চেষ্টাসাধনা করেছে এর পেছনে। বন্ধুর বাবার কাছ থেকে বিমান তথা বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত অনেক তথ্যাদি উদ্ধার করেছে। ডিক যখন ক্লাশ সেভেনের ছাত্র, তখন সে কী সব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজেই একটা বেলুন তৈরী করে ফেললো। ডিক তাতে চড়ে প্রায় কোয়ার্টার কিলো ওপরে উঠেছিলো। নেমেও ছিলো খুব সূক্ষ্মভাবে। তা দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে জব্দ করলো। নিষেধ করলো, সরকারের বিনাঅনুমতিতে আর যেনো কখনো আকাশে না ওড়ে।

কিন্তু, দুঃসাহসিক এই সত্য সমর্থক কিশোর শেষ পর্যন্ত জব্দ আর রইতে চাইলো না। টুইন টাওয়ারের মতো একটা উল্লেখযোগ্য ভবনে বিমান হামলা করার জন্য তার ভেতরটায় খুব তোলপাড় চলতে লাগলো।

আরো ক'দিন পর ডিক তাদের এলাকায় একটা প্রাইভেট এভিয়েশন কোম্পানী থেকে একটি বিমান ভাড়া নিলো। ইতস্ততঃ না ভেবে ঝটপট চেপে বসলো তাতে।

ডিক তার পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে লিখলো–

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিথ্যের প্রবর্তক। তারা ইয়াহুদীদের প্ররোচনায় গোটা বিশ্বকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। তারা বিশ্বব্যাপী নিরপরাধ মুসলমানদের মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছে। তাদের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলা হয়েছে, আমি খুবই খুশী হয়েছি এবং আমি নিজেও তাদের আরেকটি অহংকার ধ্বংস করে দিলাম।"

– ইতি

ডিক ফুলার

এই চিরকুট পকেটে পুরেই ফুলার বিমান আকাশে তুললো। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের টাম্পারে ব্যাংক অব আমেরিকায় আত্মঘাতী আঘাত হানলো।

বহুতল ভবনটার ক্ষতিসাধিত হলো সামান্যই। হালকা বিমানটার সম্মুখভাগ দুমড়ে মুচড়ে আটাশ তলার এক ব্যালকনিতে ঝুলে রইলো।

হাজার হাজার দর্শক এসে ভীড় জমালো ব্যাংক অব আমেরিকা ভবনের সামনে। উদ্ধার কর্মীরা ছুটে এসে ডিককে উদ্ধার করলো। কিন্তু, ডিক কিছুই বলতে পারলো না। দু'দিনপর নিউইয়র্ক হাসপাতালে মারা গেলো ডিক ফুলার। তার পকেটের চিরকুটটা সরকারী লোকজন গোপন করে ফেলতে চাইলেও আদালতের মাধ্যমে তার বাবা-মা এটি হস্তগত করে মিডিয়াকে প্রদান করলেন।

ইসলামের পক্ষে এমনি আরো কতো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে বিধর্মী আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা। এরই মধ্য দিয়ে পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয়ে গেলো এ্যানথ্রাক্স আতংক। বিভিন্ন প্যাকেটে, চিঠির খামে, গিফ্‌ট বক্সে এ্যানথ্রাক্স পুরে দিচ্ছে নাম ঠিকানা বিহীন কে বা কারা। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোস্টনসহ অনেকগুলো শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেকে এ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হলে এ আতংক আরো বেড়ে গেলো। ঘটনাক্রমে এ্যানথ্রাক্সের একটা প্যাকেট মিথিলার পিতার হাতেও এসে পড়লো। ভাগ্যিস মিথিলা ইসলামিক জিহাদ মিশন থেকে র‌্যামনকে সঙ্গে নিয়ে একবার পিত্রালয়ে ছুটে এসেছে। এসেছে এই জন্য যে, পিতা মাতা ভ্রাতা-ভগ্নিকেও সে মুসলমান হয়ে যাবার আহ্বান জানাবে। এরই মধ্যে রবার্ট হুক যখন চিঠির খামটা খুলতে যাবে, তখনি মিথিলা পিতার হাত থেকে খামটা কেড়ে নিলো। কম্পিউটারে পরীক্ষা করে দেখলো এ খামে এ্যানথ্রাক্স রয়েছে। মিথিলা কাউকে কিছু না বলে প্যাকেটটা গোপন করে র‌্যামনকে নিয়ে পূণরায় ফিরে এলো খালিদ বিন আতাউল্লাহ্‌র আস্তানায়। চিঠির খামটা তাসনিমের হাতে তুলে দিয়ে মিথিলা বললো- এটাতে এ্যানথ্রাক্স রয়েছে।

তাসনিম যেনো আকাশ থেকে পড়লো- বলেন কি! তবে আর এটা এখানে এনেছেন ক্যানো আপনি!

– এনেছি এই জন্য যে, এ্যানথ্রাক্স সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা জানতে চাই। আপনারা যাতে এটা দেখে শুনে এর নেগেটিভ সাইড এবং প্রেরক গোষ্ঠীর হদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এমন কথা শুনে তাসনিম বললো– থ্যাংকয়্যূ।

তারপর তাসনিম তার টিমের সঙ্গে মিথিলা ও র‍্যামনকেও নিয়ে হাজির হলো খালিদ বিন আতাউল্লাহ্ সকাশে।

বিস্তারিত জেনে খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন– এ্যানথ্যাক্স হলো খুবি মারাত্মক একটা সংক্রামক ব্যাধি। যার উৎপত্তি ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিন নামক এক প্রকার জীবাণু থেকে। গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ও হরিণের মতো জাবরকাটা প্রাণীর দেহে এ জীবাণু পাওয়া যায়। এই প্যাকেটে সেই জীবাণুই রয়েছে। যা চামড়া ভেদ করে অথবা ক্ষত স্থানের রক্তের সাথে মিশে গিয়ে মানবদেহে প্রবেশ করে। যে স্থান থেকে এ জীবাণু প্রবেশ করে শরীরের সে অংশ কালো হয়ে যায়, ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং ভেতরে বিষাক্ত পোকার কুটকুট কামড় অনুভূত হয়। এর জীবাণু বাহক ব্যক্তি প্রথমে মনে করবে সে সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। ক্রমেই দেখা যাবে শাসকষ্ট বাড়ছে এবং মাঝে মধ্যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। এই সংক্রমনটা খুবই ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে প্রাণহানীর হার প্রায় নব্বই শতাংশ।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ আরো কিছু বলতে যাবেন এরই মধ্যে নুসাঈফা বলে উঠলো এই জীবাণু প্যাকেট কারা ছাড়ছে, ভাইয়া?

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- এটা অবশ্যি চিন্তার বিষয়। তবে, সময়ের ব্যবধানে এর হদিস আমরা পেয়ে যাবো। তোমরা কোনো চিন্তা কর না।

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ কামাল হাসানকে ডেকে এ্যানথ্রাক্সের খামটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন- এটা দূরে কোথাও মাটির নিচে পুঁতে রেখে এসো। কামাল ওকে ভাইয়া, বলে বিদায় হলো।

দিন যতো যায় এ্যানথ্রাক্স আতংক ততো জোরদার হয়ে বসে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বস্তরে। সবাই ভাবছে, জীবাণু হামলা হঠাৎ বড়ো কোন হামলায় রূপ নিতে পারে। সবার ভেতরে আরো বেশী উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র মহা সড়কগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করছে। মার্কিন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন, না জানি আবার কোন হামলা কোন ভবনে চলে, না জানি কোন ব্রিজ, সুড়ঙ্গ পথ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের ওপর আবার নেমে আসে ধ্বংস লীলা।

এই ভেবেই তারা নিরাপত্তা বিধান ও ভারসাম্য রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা বাহিনীও কাজ করে যাচ্ছে সমান তালে। এরই সুযোগে ইয়াহুদী লবীর একচেটিয়া ষড়যন্ত্রে বিভিন্ন স্টেটস-এ মুসলমানের ওপর নির্যাতন বেড়েছে। বিভিন্ন স্থানে অযথা হানা দিয়ে মুসলমানদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

সৌদি আরব, ইরাক, পাকিস্তান, বাংলাদেশের অনেক মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে তারা। এ ছাড়াও মুসলমানদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। ভাবখানা এমন যে, মুসলমান হয়ে জন্ম নিয়ে বেচারা বড়ো অপরাধ করে ফেলেছে। এরই পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নির্লজ্জ বন্ধু বৃটিশদের নিয়ে আফগানিস্তানে নির্মম হামলা অব্যাহত রেখেছে। শত শত ইঙ্গমার্কিন জঙ্গী বিমান থেকে বোমার পর বোমা ফেলা হচ্ছে। নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার মুসলমান।

নিরপরাধ অসহায় আফগানদের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পৈশাচিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিম আজ আরো বেশী তেতে উঠেছে। মানবিক প্রশ্নে বিধর্মীরাও পক্ষ নিয়েছে আফগানিস্তানের। দেশে দেশে আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠছে যুদ্ধ নয়, শান্তি। বুশের কুশপুত্তলিকা আরো বেশী দাহ হচ্ছে দেশে দেশে। কিন্তু, তাতেও বুশ দাজ্জালের হুশ হচ্ছে না কোনো। তাই তার হুশ ফেরাবার জন্য খালিদ বিন আতাউল্লাহ নিউইয়র্কের ম্যানহাটানেই তার কুশপুত্তলিকা দাহ করতে চান। আর এজন্য তিনি নির্বাচিত করলেন তাসনিমকেই।

এশার নামাযের পর লাইব্রেরীর গোল টেবিলে বসে তাসনিম টিমকে নিয়ে কথা বলছেন খালিদ বিন আতাউল্লাহ– ওরা যেভাবে ক্ষেপেছে, মুসলমানদের যেভাবে কামড়াচ্ছে তাতে তো আমরা আর গুহায় বসে থাকতে পারি না, আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমরা মিটিং করবো, মিছিল করবো, ম্যানহাটানেই ডব্লিউ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করবো। এরপর তিনি তাসনিমের চোখে চেয়ে বললেন- কি তাসনিম, তুমি রাজী আছো তো?

তাসনিম যেনো জবাব দেয়ার জন্য তৈরীই ছিলো, বললো, অবশ্যই। একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কারোর ভয় এ বুকে নেই। বাংলার জাতীয় কবি নজরুলের দুটি লাইন আমাতে অকৃত্রিম কাজ করে–

"আমি আল্লাহর সৈনিক মোর কোন বাঁধা ভয় নাই

তাহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন ছিন্ন করে যাই।"

খালিদ বিন আতাউল্লাহ মৃদু হেসে বললেন- মারহাবা! মারহাবা!! এইনা হলে কি আর বিশ্বমুজাহিদ! তখনি উপস্থিত অন্য সবাই সমস্বরে বলে উঠলো– অবশ্যই! অবশ্যই!!

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ তাসনিমকে বক্তৃতার কিছু থীম বাতলে দিলেন।

আরও পরে দিনক্ষণ ঠিক করে তিনি সেই আগের জায়গায় আবার এক মহাসমাবেশের ডাক দিলেন।

যথাদিনের যথাসময়ে মহাসমাবেশ জমে গেলো যথাস্থানে। প্রায় হাজার পাঁচেক মুসলমান জড়ো হয়েছে। সবার হাতেই যুদ্ধ বিরোধী ফেস্টুন, ব্যানার, কারো হাতে বুশের কুশ পুত্তলিকা।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বক্তৃতা শুরু করলো তাসনিম। উপস্থিত ধর্মপ্রাণ ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম। এগারোই সেপ্টেম্বর নাটক সাজিয়ে ইয়াহুদী ও খৃস্টশক্তি আফগানিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের ওপর যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলা ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে তা আমাদেরকেই রোধ করতে হবে। আল্লাহর কাছে মুসলিম জাতির জন্য দোয়া করে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যা করার আমাদেরকেই তা করতে হবে। আমরা চাই ইয়াহুদী প্রভাব থেকে মার্কিনীরা মুক্ত হয়ে আসুক। বন্ধ করেদিক মুসলিম পীড়নের স্টিম রোলার। আজ বুশকে আমরা ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই টনি ব্লেয়ারকে। আর তাদের বিরুদ্ধে আমরা গানের সুরে বলতে চাই...

তখনি তাসনিম টিমের অন্য ছয় সদস্য তাসনিমের দু পাশে সেট হয়ে গেলো এবং মিথিলা ও র‍্যামন এসেও একটু দুরে দাঁড়ালো। তাসনিম তাদের নিয়ে কোরাস ধরলো–

ধিক্কার! ধিক্কার!! ধিক্কার!!!
ধিক্কার বিশ্বের মানবাধিকার
ধিক্কার বিশ্বের শিশু অধিকার
ধিক্কার বুশ
ব্রেইন ল্যুস
ধিক্কার টনি ব্লেয়ার
ধিক্কার! ধিক্কার!! ধিক্কার!!!

ইংরেজ বেনিয়া কাফের শয়তান
চিরদিন ভেঙ্গেছে মুসলিম সম্মান
আজ আর ঘুম নেই
জেগে গেছে সকলেই

হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার
ধিক্কার! ধিক্কার!! ধিক্কার!!!

চেচনিয়া কসোভো ফিলিস্তিন আফগান
তোদেরই জুলুমেতে ব্যথাহত সবখান
সবে আজ বলছে
পায়ে বুশ দলছে
মুখে আল্লাহু আকবার
ধিক্কার! ধিক্কার!! ধিক্কার!!!

গান শেষ হবার আগেই বুশের বিশাল কুশপুত্তলিকা দাহ করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দাউ দাউ আগুন ততোক্ষণে আকাশ ছুঁতে চাইছে। পাশাপাশি শ্লোগানের পর শ্লোগান চলছে সমাবেশে– "নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার"

"বুশরে বুশ- হয়ে যা হুশ!"

কুশ পুত্তলিকার আগুন নিভে যাবার পর অবশিষ্ট জ্বলন্তাংশে আবু হিশাম বাম পা দিয়ে কষে লাথি মেরে বললো- মর!মর!! নিপাত যা!!!...

তখনি দূরের কোন ভবন থেকে মেশিনগানের শত শত গুলি এসে সভাস্থলে আঘাত করতে লাগলো। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো সমবেত লোকজন। কিছু হতাহত হলো।

তাসনিম তার টিমের সবাইকে নিয়ে সরে আসতে পারলো না, মিথিলা ও মাখদুম ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়েছে। বাকীদেরকে নিয়ে তাসনিম অনতিবিলম্বে গিরিকন্দরের পথ ধরলো। এদের ভেতরে নকীব ও র‍্যামন গুরুতর আহত আর নুসাঈফা মেহরীনের ডান পায়ের নিচে জখম হয়েছে বেশ খানিকটা।

আস্তানায় ফিরে আসার পর নিজস্ব ডাক্তার-নার্স দিয়ে আহতদের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রুষা চলতে লাগলো পুরো দমে। এরপর তারা মোটামুটি সুস্থ হলে খালিদ বিন আতাউল্লাহ আবার তাসনিম টিম নিয়ে বসলেন। বললেন- এভাবে আমরা কোন ফল লাভ করতে পারব না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতে হবে আমাদের। তোমাদেরকে যেতে হবে আফগানিস্তান, সেখানে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে হবে। আর বৈজ্ঞানিক উপায়ে নষ্ট করে দিতে হবে ইঙ্গ মার্কিন সমরাস্ত্র, বিকল করে দিতে হবে শক্তিশালী বোমা।

তাসনিম বললো- ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে পারমানবিক বোমা ফেলবে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- ভয় নেই। ডিপোতে সংরক্ষিত সকল পরমাণু বোমা অকার্যকর করে দেয়ার মতো প্রোগ্রাম আমি তোমাদের দিয়ে দেব। আজ আর পৃথক নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। আমেরিকার এই ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের জবাব অবশ্যই দিতে হবে। তোমরা চলে যাও আফগানিস্তান আর মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত খুলে দেয়ার আহ্বান আমি পৌঁছে দিচ্ছি সমগ্র বিশ্বে।

তাসনিম বললো-ওকে ভাইয়া। আমরা তৈরী আর সীমান্ত খুলে দেয়ার ব্যাপারটায় জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশাকরি। যে করেই হোক সীমান্ত খুলে দিতেই হবে।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন-ইন্‌শাআল্লাহ।

তারপর তিনি ইঙ্গমার্কিন জঙ্গী বিমানের কার্বন সাতটা জঙ্গী বিমান ভর্তি তিনশ' তেরজন উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন মুজাহিদ আফগানিস্তানে প্রেরণ করলেন তাসনিমের নেতৃত্বে এবং প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র, প্রোগ্রাম, সরঞ্জামও সঙ্গে দিয়ে দিলেন তাদের।

চার.

মহান আল্লাহর সৃষ্ট এ জমিনে এক পবিত্রতম দেশের নাম আফগানিস্তান। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত উমর (রা.)-এর আমলে হযরত আসেম আত-তামীমী কর্তৃক বিজিত এই আফগানিস্তান চিরদিনই তার ইসলামী ভাব আদর্শে বলীয়ান রয়েছে। গরিব, সাদাসিদা, আলাহওয়ালা আফগানরা যুগ যুগ ধরে বদর ও উহুদের সেই অবিস্মরণীয় আদর্শ আঁকড়ে রয়েছে- শির দেগা, নেহী দেগা আমামা। এ দেশেরই বাদশাহ হাবীবুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে আঁতাত করার পরিনামে উত্তপ্ত গণ জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলো তার লাশ, বাদশাহ আমানুল্লাহরও একই অবস্থা হয়েছিল । বৃটিশরা পাক-ভারত বাংলাসহ প্রায় সমগ্র বিশ্বে তাদের আধিপত্য বিস্তারের লালসা ফলে যাওয়ার এক পর্যায়ে ১৯৪২ সালে আফগানিস্তানেও তারা তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছিলো, কিন্তু, মুসলিম জোয়ানদের তোড়ের মুখে টিকে থাকতে পারেনি মোটেও। বৃটিশের বার হাজার জন্য তারা গিলে ফেলেছিল। পবিত্র বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ

মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যে পাঁচ হাজার ফেরেশতাকে সৈন্য হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন সেই ফেরেশতারাও হয়তো যোগ দিয়েছিলেন এই সভ্য সঠিক মুজাহিদদের সঙ্গে।

এ ভূমিতো বড় পবিত্র ভুমি। এর সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন- বায়হাকী, বলখী, হারভী, ইবনে হাব্বান, তিরমিজী, নাসায়ী, বোখারী, ফখরে রাযী, আল বিরুনী, ফারাবী, ইবনে সিনা, ও খাওয়ারেজমীর মতো ইতিহাসের সুবিখ্যাত সোনার মানুষেরা। বিশ্বখ্যাত সূফী সাধক, সুসাহিত্যিক মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী লিখেছেন, একই ফুলের রেনু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মৌমাছি আর বোলতা। কিন্তু মৌমাছির পেটে তা মধু হয় আর বোলতার পেটে হয় বিষ। তা-ই-তো, একই পৃথিবীর আলো বাতাস খেয়ে মানুষ পরিচয়ে বেড়ে ওঠা মানুষগুলোর একদল থাকে অন্ধকারে আরেকদল হয় আলোর পথের যাত্রী।

জালালুদ্দীন রুমী আফগানিস্তান ছেড়ে গিয়েছিলেন কিশোর বয়সে। সমগ্র এশিয়া জুড়ে তখন ইতিহাসের অন্যতম মহা সন্ত্রাসী, জঘন্যখুনী চেঙ্গিস খানের একচেটিয়া তাণ্ডব লীলা। চেঙ্গিস খান যেদিক দিয়ে যায়, সেদিকের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ ভেসে যায় রক্তের বন্যায়। আফগানিস্তানে চেঙ্গিস খান আসছে খবর শুনেই তদানীন্তন কত আফগান প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছেন কত মুসলিম দেশে। কিশোর জালালুদ্দীন রুমীও তখন পরিবারের অন্যদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন বাগদাদ। চেঙ্গিসের মত নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত হালাকু খানও রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়, লাখ লাখ মানুষকে জড়ো করে কী নির্দয় ভাবে জবাই করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন বাগদাদে। আজ আফগানিস্তানে বুশ ও বৃটেনের তান্ডবলীলা সেই চেঙ্গিজি পাশবিকতাকেও হার মানিয়েছে।

আফগানিস্তান একটি সত্যিকারের ইসলামী দেশ। আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ২ কোটি। পাকিস্তানের উত্তরে, ইরানের পূর্বে অবস্থিত ২,৫০, ০০০ বর্গ মাইল সীমানা। রাজধানী কাবুল, লোক সংখ্যা ৬ লাখ। ১৯৭৩ সালে এদেশের রাজতন্ত্র শেষ হয়। মোট জমির শতকরা ৫ ভাগে চাষাবাদ হয়। পশতুন ভাষায়ই এদেশের বেশীরভাগ লোক কথা বলে। এদেশে সমুদ্র উপকুল এবং রেলপথ নেই। এটি একটি গরীব দেশ হলেও গোটা বিশ্বে এমন আল্লাহভীরু দেশ আছে বলে জানা নেই। ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও ক্রুসেডাররা নানান ছলে ছুতোয় লাদেনের অজুহাতে আফগানিস্তান তথা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। ইঙ্গ মার্কিন ও বৃটিশ বোমারু বিমান থেকে নির্বিচারে বৃষ্টির মত শত শত টন

হরেক রকম বোমা ফেলে ফেলে প্রলয়ঙ্করী উল্লাসে মেতে উঠেছে পাপিষ্ঠ পামর। বিশাল এলাকাজুড়ে অগ্নিকুণ্ডলী ও ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বারুদে পোড়া ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে ঘর-বাড়ি, পশু-পাখি, গাছপালা নারী-পুরুষ তথা হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান। আল্লাহর পবিত্র জমিনে আল্লাহর সৃষ্ট সুন্দর প্রকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করছে মুখোশধারী শয়তান। পর্বতময় আফগানিস্তানের পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে ঢালে হৃদয়নন্দন সবুজ গম ক্ষেত আর ঝরনার দু'পাশে আঙ্গুর আপেল ক্ষেতের সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য এখন আর নেই। ধ্বংস হয়ে গেছে পানশির, পারওয়ান, কুন্দুজ, মাজার-ই শরীফ আর কাবুলের মত বৃহত্তর সব জনপদ। তবুও চলছে এই ধ্বংসলীলা। আকাশে উঠছে লাখো রোনাজারি– আয় আল্লাহ এই নব্য ফিরাউন, নমরূদের হাত থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দিন। রক্ষা করুন আল্লাহ! এতকথা জেনেই তাসনিম এই ভুমিতে পা রেখে সর্বপ্রথম গলা হাকলো- তাসনিম এসে গেছে ইনশআল্লাহ তোমরা যারা বিধ্বস্ত দুঃস্থ অসহায় নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিরুপায় আছো; গরিব, দুঃখী, বুভুক্ষ, এতিম, মিসকিন নির্মম মানবেতর যারা আছো তাদের আর কোন দুঃখ নেই, আল্লাহ রাহে মুজাহিদ এসে গেছে। কান্দাহার এয়ারপোর্টে সাতটি কার্বন ইঙ্গ মার্কিন বিমান ল্যান্ড করতেই স্থানীয় তালেবান নেতা ইসমাঈল তার সহস্রাধিক সহকারী নিয়ে তাসনিম টিমকে স্বাগত জানালো। খালিদ বিন আতাউল্লাহ ইসমাঈলের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে রেখেছেন। ইসমাঈল বিস্তারিত জেনে খালিদ বিন আতাউল্লাহকে ধন্যবাদ জানানোর পর থেকেই বিমান গুলোর অপেক্ষায় ছিল।

ঈষৎ কুশলাদি বিনিময়ের পর ইসমাঈল চট জলদি আগন্তুকদের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করলো। সেই সঙ্গে বিমানে আনয়নকৃত সমরাস্ত্র ও পারমানবিক বোমা অকার্যকর করার সরঞ্জামাদিও সরিয়ে ফেললো। মোজাহিদরা বিমান সাতটাও কৌশলে গিরি কন্দরের ঢালে ঢালে লুকিয়ে ফেললো।

তালেবানদের এ ক্যাম্পটা প্রায় তিন কি.মি. জায়গা জুড়ে। গুজরান গ্রামের গাঁ ছোয়া দুর্গম গিরি কন্দরের ভেতরে আঁকা বাকা পথ শেষে এই শিবির ক্যাম্পের ঠিকানা। গাড়ি নিয়ে এখানে কেউ আসতে পারে না। এর এক কিলোমিটার সীমানায় আসতে হলেও তাকে অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে আসতে হয়।

গোপন ক্যাম্পের ভেতরে শতাধিক রুম, ট্রেনিং মাঠ, অস্ত্র গুদামসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

তাসনিম এই তালেবান ঘাঁটির কিছুটা দূরে তার বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম জাহির করলো। বিশেষ ধরণের ক্ষেপনাস্ত্র সাজিয়ে নিয়ে তৈরি রইলো সে। যখনই শত্রুপক্ষের কোন ক্ষেপনাস্ত্র হামলার সংকেত পাওয়া যাবে, তখনি এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৈরি করা হবে লেজার রশ্মি এই লেজার রশ্মিই গিয়ে আঘাত করবে মহাকাশে ছুটে আসা ক্ষেপনাস্ত্রকে। ধ্বংস হয়ে যাবে শত্রুর অস্ত্র। বেঁচে যাবে লাখ লাখ প্রাণ।

তাসনিমের একনিষ্ঠ সহকারী আবু হিশাম, নকীব আল জিহাদ, দেলওয়ার, নুসাঈফা মেহরীন, তামান্না সালওয়া ও নওমুসলিম নাসিমা সারাক্ষণ তার পাশে পাশেই আছে। তারা বসে আছে, ছোট একটা টিলার আড়ালে পৃথক পৃথক হয়ে আর তালেবান কিছু প্রহরী কতগুলো ট্যাংক ও বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে তাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। যেনো কোনো অশনি সংকেত দেখলেই তারা সিগন্যাল দিতে পারে আর শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করতে পারে। তাসনিম টিম এর প্রতিজন সদস্য-সদস্যার হাতেও রয়েছে যুদ্ধাস্ত্র, কারো হাতে মেশিনগান কারো হাতে গ্রেনেড, এরই মাঝে একবার নুসাঈফার একান্ত ইচ্ছে জাগে, প্রাণের মানুষটিকে মনের কথাটা জানিয়ে দেই। যার জন্য এত কিছু, সেই তাকে যদি মূল খবরের কিছুই না জানাই তবে তো নিজেকে নিজে সৎসাহসী হিসেবে জ্ঞান করতে পারবো না। কী হবে, আমিতো তাকে ভালবেসেছি, খারাবি তো কিছু করিনি। আর প্রেম তো শাশ্বত, সেতো যুদ্ধ বোঝে না, ক্ষুধা বোঝে না, মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছেও মানুষ প্রেমের ঠিকানটুকু পেতে চায়, আর আমি তো এখনো বেঁচে আছি।

তামান্নাও আজ এই একই কথা ভাবছে, সে-ও আনমনে প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো, যে করেই হোক আবু হিশামকে আজ সে তার ভালোবাসার বাণীটি শুনিয়ে দিবে। কী হবে, মেরে তো আর ফেলবে না। ফেললে ফেলুক। ভালোবাসার ক্ষেত্র যদি মেরেও ফেলে তবে তো সেই মরণেও বড়ো সুখ থাকে। পৃথিবীতে প্রেমই যদি সবার বড়ো হয়, তবে তো আমি ভুল কিছু করছি না।

এরপর তারা দু'বান্ধবী মিলে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আরো ক'দিন থাক। তা না হলে ছেলেগুলো তাদেরকে বাজে মেয়ে হিসেবেও জ্ঞান করতে পারে। কোন বেয়াড়া মেয়েকে কেউ মর্যাদা দেয় না। নষ্ট বাবুরা শুধু আপন ফায়দা বাগাবার জন্য সাময়িক আদর ভালোবাসার অভিনয় করে যায়। ভালো বাবুরা নষ্ট মেয়েদের দিকে কখনো ফিরেও তাকায় না, আর তাকালেও তাদের অন্তরে ব্যভিচারিনীর প্রতি ঘৃণাবোধের এতটুকু কমতি থাকে

না। অবশ্যি পৃথিবীর সব নারী তা জানে না। যদি জানতো, তবে এত নারী এত বেলেল্লা হয়ে ছুটে বেড়াতো না দেশে দেশে।

আজ তাসনিমের মনটাও খুব বিদ্রোহ করছে। বাংলাদেশের কথা মনে পড়ছে তার, মাকে মনে পড়ছে, শায়লাকে মনে পড়ছে। আমেরিকা থাকাকালীন সেই যে কবে শায়লাকে ফোন করেছিলো এরপর আর কোন যোগাযোগ হয়নি।

খালিদ বিন আতাউল্লাহর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলার পর তাসনিম বসা ছেড়ে উঠে একা একপাশে চেপে গিয়ে শায়লাকেও একটা রিং দিলো, শায়লা জানতে চাইলো–কেমন আছো?

– আলহামদুল্লিাহ, ভালো আছি। তোমরা সব ভালো তো।

– সব ভালো হলেও আমি তো আর ভালো নেই।

– কেন!

– কেন আবার! এই যে তুমি কাছে নেই, তাই।

তাসনিম বললো– আমি যে জিহাদকেও ভালোবাসি, ভালোবাসি মানুষকে। মানুষের শান্তির জন্য অমানুষকে ধ্বংস করতে ভালবাসি। আর সেই ভালবাসাকে ফলপ্রসূ করতে ছুটে যেতে হয় এক প্রান্তর থেকে আরেক প্রান্তরে। ভুলে যেতে হয় জীবনের পরিচয়। তাই, পর্যাপ্ত সময় তো তোমাকে কোনদিনই দিতে পারবো না। আমাকে ভুল বুঝোনা, প্লিজ আর এমন প্রার্থনাও তুমি কখনো করোনা যে, তাসনিম যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে এসে তোমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হোক বরং এই দোয়াই করো, আমার যেনো শহীদি পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এ জীবনকে সার্থক করতে পারি।

– তাসনিম!

– কেঁদো না শায়লা। হয়তো দেখা হবে, কিংবা দেখা হবে না।

ফোন অফ করে তাসনিম চেয়ারে ঢিলেঢালা হয়ে বসলো। তখনি ইসমাঈল ছুটে এসে বললো আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। জ্বি চলুন, বলে তাসনিম তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে ইসমাঈলের সঙ্গে পথ ধরলো।

দুর্গম পাহাড়ের আঁকা বাকা, অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ হয়ে কয়েকটি পাহাড়ী ঘর পেরিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হলো কাংখিত এক রুমে, যেখানে বসে আছেন মহা কালের মহা নায়ক শায়খ ওসামা বিন লাদেন। রুমের এক কোণে ছোট একটা খাটিয়া ছাড়া আর কোনো আসবাব পত্র নেই। পাহাড়ের গা কেটে বানানো বুক শেল্‌ফ-এ শত শত বই, মেঝেতে একটুকরো নীল চাদর। সে চাঁদরে বসে

হাতে তসবিহ নিয়ে কেবলি দোয়া পড়ে যাচ্ছেন শায়খ বিন লাদেন। তার ডান হাতের কাছে একটা সাব মেশিনগান শোয়ানো।

বিন লাদেনকে দেখতেই তাসনিম টিম এর সবাই আনন্দ বিস্ময়ে উদ্বেলিত হয়ে পড়লো। এ তো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি, তাসনিম এই ভেবে আরো অবাক হল যে, এমন ভূবন বিখ্যাত একজন লোক কী সাদামাটাভাবে বসবাস করেন, আর তার গায়ে তো যোদ্ধা বা কমান্ডারের পোশাকও নেই, দীর্ঘ হালকা দেহের শায়খের পরনে আরবীয় জামা। সেই সঙ্গে লম্বা পাগড়ী তাঁর মাথায়। কী মায়াময় শান্ত শিষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন তিনি। তাসনিমের হৃদয় তলে বিন লাদেনের প্রতি আপনা হতেই পরম শ্রদ্ধাবোধ উথলে উঠলো। সালাম জানিয়ে তাসনিম বিন লাদেনের আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে মোসাফাহা করলো। কী কোমল ওই হাত, কী মধুর ও মুখের কথা, তাসনিমের অন্তর পুরো গলে গেলো। বিন লাদেন আলতো স্বরে বললেন– বসুন আমি আপনাদের সম্পর্কে জেনেছি। তাসনিম ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীদেরকে নিয়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে তাঁর সামনে বসলো, লাদেন বললেন- বুঝলেন, আমাকে ধরা আমেরিকার মূল কাজ নয়, আফগানিস্তান একটি সত্যিকারের ইসলামী দেশ, তাই ক্রুসেডাররা নানান ছল ছুঁতোয়, আমার অজুহাতে আফগানিস্তান তথা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

আবু হিশাম বিন লাদেনের চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো– আচ্ছা শায়খ ওরা আপনার ওপর এতটা ক্ষেপেছে কেন। আমরা আপনার সম্পর্কে আপনার মুখ থেকেই কিছু জানতে চাই। লাদেন বললেন– ওরাতো আজ নতুন ক্ষ্যাপেনি। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ঘটে আসছে মুসলিম সভ্যতা ও ইয়াহুদী-খৃস্টান সভ্যতার সংঘাত। আমি পবিত্র ভূমি সৌদি আরব থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তিকে বিতাড়িত করার জিহাদে অবতীর্ণ হলেই ওদের আঁতে ঘা লেগে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা আঁধারবাদীদের দৃষ্টিতে আমি শত্রু হয়ে যাই, সন্ত্রাসী হয়ে যাই। আমাকে মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করে তারপর মেরে ফেলার পাঁয়তারা করা হয়, কিন্তু আমার আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তবে কার সাধ্যি আমাকে মেরে ফেলার। অবশ্যি পশ্চিমাদের শত্রু হয়েছিলাম আমি আরো আগে ১৯৭৯ সালে। রাশিয়া আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করার মানসে যখন আফগানিস্তান দখল করে ফেললো, তখন আমি রেডিওতে এই খবর শোনামাত্রই আর স্থির থাকতে পারলাম না। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম আফগানিস্তান। এক লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিলো, তারা দীর্ঘ দশ বছর এদেশ চষে বেড়িয়েছে। ১৫ লাখ আফগানী তারা হত্যা করেছে, ১০লাখ লোককে পঙ্গু করেছে। শুধু কি তাই জিহাদী মুসলিম নওজোয়ানদের তোড়ের মুখে ভেগে যাওয়ার আগে কুচক্রী সোভিয়েত এই আফগানিস্তানের মাটিতে ১ কোটি মাইন পুতে রেখে গেছে। সে সব মাইন বিস্ফোরণে আজো কতো তরতাজা প্রাণ কতো নিষ্পাপ শিশু নিহত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটাতে অবশ্যি কম বেগ পেতে হয়নি। সোভিয়েত আক্রমণ কালেই গঠিত হয় তালেবান। তালেবান মানে ছাত্রদল। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জিহাদে যে টগবগে ছাত্ররা সেদিন মিলিত হয়েছিল আল্লাহ পাকের মেহের বাণীতে আমি তাদের পাশে পাশে থাকতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র কেনার জন্য তাদেরকে মিলিয়নকে মিলিয়ন ডলারের অংকে অর্থের যোগান দিয়েছি। গোপনে সৌদি আরব থেকে হাজার হাজার টন যুদ্ধোপকরণ এনেছি। আরো এনেছি ট্যাংক, বুলডোজার, ডাম্প খোঁড়ার যন্ত্রপাতি, ট্রাকসহ ইত্যাদি ভারি যানবাহন। সোভিয়েত সৈন্যের বোমা-গুলি এড়িয়ে মাইলের পর মাইলব্যাপী সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার ভেতরে বানিয়েছি হাসপাতাল, খাদ্য ও অস্ত্রগুদাম। সোভিয়েতরা বিদেয় হবার পর এদেশে তালেবান সরকার গঠন হলো, তালেবানরা তো মন্দ কিছু করেনি। তারা প্রতিটি নারীর জন্য ইসলামী হিজাব বা পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করেছে। এই আফগানিস্তানে এক সময়ে উপঢৌকন হিসেবে নারীদেরকে বিনিময় করা হতো, ইসলাম ধর্মে এ ধরণের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকলেও এক শ্রেণীর লোক এ দেশে তা চালাতো। এটা ছিলো সামাজিক রীতিনীতি, দুটো বিবাদমান গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রফা করতে চাইলে তারা নারী বিনিময় করতো। তালেবানরা তা বন্ধ করে দিয়েছে। এদেশের নারী অধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা পুরোপুরি অসত্য, তালেবানতো সেই কাজগুলোই করেছে, যে কাজে আল্লাহ খুশী থাকেন, যে কাজে নিজেদের ভেতর কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে না পারে। তারা পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ও ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করেছে। অফিস আদালতে ধুমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদ্যপান তথা নেশাজাতীয় যে কোন দ্রব্য ড্রাগস এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোন বিবাহিত নারী-পুরুষ অবৈধ যৌনকর্মে জড়িত থাকলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার নির্দেশ রয়েছে। চুরি করলে হস্তকর্তনের বিধান রয়েছে। অশ্লীল সকল আমোদ প্রমোদের ওপর বিধি নিষেধ জারি রয়েছে। পাশ্চাত্য ঘেঁষা খোলামেলা পোশাক

নিষিদ্ধ রয়েছে। তাস, দাবারমতো অর্থহীন অনেক খেলাধুলাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পুরুষদের মসজিদে যাওয়া এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর জনগণের কাছ থেকে সকল প্রকার অস্ত্রাদি ফেরত পাবার ফরমান জারি রয়েছে। আর এতসব জেনেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওই ঘৃন্য কুচক্রীদের। তারা চায় এদেশ থেকে এই ইসলামী সরকারকে উৎখাত করে তাদেরই মদদপুষ্ট কোন মোনাফেক সরকারকে স্থলাভিষিক্ত করতে আর তাইতো এমন ঘৃন্য উল্লাসে মেতেছে পুরনো শকুন। এরই মধ্যে দু'জন মুজাহিদ ট্রেতে করে কিছু আপেল আঙ্গুর এনে তাসনিম টিমের সামনে রাখলো। বিন লাদেন ডান হাত বাড়িয়ে মোলায়েম স্বরে আহ্বান জানালেন, নিন, শুরু করুন। তাসনিম বললো, শায়খ, আমরা তো খেতে আসিনি। লাদেন বললেন– যাই হোক, আপনারা আমার মেহমান।

আবু হিশাম বললো– আমরা এসেছি শেষ সময়ে। এখন তো এদেশের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে।

লাদেন বললেন– তারপরও যতটুকু পারেন কাজ করুন।

সাক্ষাৎকারের শেষে তাসনিম টিম যখন পার্বত্য গিরিসংকটের ঘোরপ্যাঁচ ভেদে সমতলে ফিরছিল তখন তাসনিম গাইছিলোঃ

"উত্তর থেকে দক্ষিণে মেরু
সীমান্ত খুলে দাও, খুলে দাও
সারা বিশ্বের মুসলমানের
বন্ধন ছিঁড়ে দাও"

তার বাংলাদেশী সাথীরাও এর সাথে কণ্ঠ মিলাচ্ছিলো। বাংলার এক বিপ্লবী কবির এ সংগীত তখন আফগানিস্তানের পার্বত্য গিরিকন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করছিলো

এরই মাঝে বোমারু বিমান থেকে একটা ক্লাস্টার বোমা পড়ে সম্মুখ ভাগের সুড়ঙ্গ ঘর বিধ্বস্ত হয়ে আকাশ বেরিয়ে পড়েছে। উপস্থিত সবাই পজিশন নেয়ার আগেই আরেকটা বোমা এসে পড়লো তাসনিম টিমের ঠিক দেড় হাত সামনে। কিন্তু, কী আশ্চর্য যে, বোমাটা বিস্ফোরিত হলো না। তাসনিম হাতে তুলে সেটা দেখলো, সবি ঠিক আছে, কিন্তু কেনো বিস্ফোরিত হলো না, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তবে এরই মাঝে শুরু হয়ে গেলো অনর্গল বোমাবর্ষণ। এক ঝাঁক দূরন্ত মৌমাছির মতো ইঙ্গ-মার্কিন বোমারু বিমান ছেয়ে আছে বিন লাদেনের ঘাঁটি সীমানার আকাশ। বোমার পর বোমা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের চার পাশ। বিন লাদেন ওয়ারলেসে ইসমাঈলকে ডেকে বললেন- অতিথিদের ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি আমার কাজে চললাম, আল্লাহ হাফেয। আলট্রা ক্যালিবার অটোমেটিক মেশিনগানটি দু'হাতে জোরে চেপে ধরে বিন লাদেন একান্ত সহকারীদের নিয়ে হারিয়ে গেলেন সুড়ঙ্গ পথের ভেতরে। ইসমাঈলও আর দেরি না করে আরো গোপন, আরো গভীরের সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের ক্যাম্পের দিকে। তারা পজিশন নিয়ে নিয়ে জোরে জোরে দৌড়াচ্ছে। তাসনিম বলে উঠলো- আরো জোরে বন্ধু, আরো জোরে...

তাদের দৌড়ের গতি আরো বেড়ে গেলো।

স্বভাবতঃই নুসাঈফা, তামান্না, নাসিমা একটু পেছনে পড়ে গেলো। নুসাঈফা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে গলা ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো- একটু আস্তে ভাই পারছিনা তো! তামান্না তাকে, অভয় দিয়ে বললো– না পারার কি আছে, এইটুকু কষ্ট তো মানতেই হবে। জোরে , আরো জোরে দৌড়...

সত্যিই তারা আরো জোরে দৌড়াতে লাগলো।

ইতোমধ্যে পুরো কান্দাহারে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আকাশে জঙ্গী বিমান আর স্থলে ট্যাংক কামানের বহর সাজিয়েছে মার্কিনী ও মিত্র বাহিনী। বোমা বিস্ফোলনে কেঁপে কেঁপে উঠছে কান্দাহারের মাটি। তালেবান সৈন্যদের পাশাপাশি নিরীহ জনগণকেও হত্যা করছে তারা, উড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদ মাদ্রাসা, স্কুল কলেজ। গুজরান গ্রামের শুরুতে যে, দ্বিতল এতিমখানাটা আছে সে ভবনেও একাধিক বোমা ফেলেছে নরপিশাচেরা। তিন শতাধিক এতিম অনাথ শিশু কিশোর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একশো জনের মতো আহত হয়ে কেউ হাত হারিয়ে, কেউ পা হারিয়ে, গাল হারিয়ে, কেউ কান হারিয়ে দুঃসহ বেদনায় কাতরাচ্ছে। এ এতিমখানার প্রধান পরিচারিকা সাবা নাজিয়াও হারিয়েছেন ডান বাহুর একাংশ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে একটু নড়েচড়ে যখন হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন, তখনি তার পেছন থেকে ওড়নির শেষাংশ টেনে ধরলো ফাহিম– তুমি যেওনা। মা তুমি যেওনা। নাজিয়া ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তার সবচে বেশী আদরের সেই মিষ্টি মুখের চেহারার সাত বছর বয়সী ছাত্রটি প্রায় নিঃশেষ হয়ে টিকে আছে কোনোমতে। পা দু'টো ভারি দেয়ালে আটকে আছে, তার মাথা ভেসে গেছে রক্তে। নাজিয়া একবার ডুকরে উঠলেন– ফাহিম।

খুব ইচ্ছে হচ্ছে ফাহিমকে এতটুকু স্পর্শ করতে, এতটুকু আদর স্নেহের মাখামাখিতে বুকের কাছে একবার জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু তা যে নাজিয়া পারছেন না। ফাহিমের দিকে ঘুরে ফেরার শক্তি মোটেই অনুভব করছেন না। তবুও নাজিয়া কাতরাতে কাতরাতে ফিরতে চাইলেন আর তখনি আবার একটা ভারি বোমা এসে পড়লো তাদের গায়ের ওপর।

এভাবেই মরতে লাগলো হাজারো মানুষ। এভাবেই ধ্বংস হতে লাগলো হাজারো ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান। তবে ধ্বংস কেবল শয়তানেরাই করলোনা। তাদেরও অনেক কিছু ধ্বংস করে দিলো তালেবান সৈন্যরা। বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে ভূ পৃষ্ঠে ফেলে দিয়েছে বেশ ক'টা জঙ্গী বিমান, স্থলের ট্যাংক কামানও ধ্বংস করে যাচ্ছে বেশ। তাসনিমও তার টিম নিয়ে গন্তব্যে ছুটে এসে লেজার রশ্মি তৈরী করে বিশেষ ধরনের ক্ষেপনাস্ত্র পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে শত্রু পক্ষের অগণিত ক্ষেপণাস্ত্র। এরই মধ্যে আরো কিছু যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত হলো এবং বেশীরভাগ বিমান অন্যত্র চলে গিয়ে হামলা অব্যাহত রাখলো।

আকাশ আরো পরিস্কার হয়ে গেলে ইসমাঈল তাসনিম টিমকে নিয়ে মূল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলো। ক্যাম্পের সীমানায় এসে ইসমাঈল বিস্ময়ে একবার থমকে দাঁড়ালো– এখানে নির্ধারিত প্রহরীরা নেই কেনো! এমন জনহীন তো এজায়গা কখনোই থাকে না। ক্যাম্পের ভেতরে এসে ইসমাঈলের সংশয় আরো বেড়ে গেলো। এটা যেনো ভূতুড়ে বাড়ি, কোথাও কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই, একি! যেখানে হাজার হাজার সৈন্য অনবরত ছুটাছুটি করে বেড়ায় সেখানে পিন পতনের শব্দটিও নেই কেন!

এরপর ইসমাঈল চোখ বুলিয়ে দেখলো, সবগুলো রুমই তালাবদ্ধ। ইসমাঈল ভেবে পাচ্ছে না- গেলো কোথায় সব! কেউই এখানে থাকবে না, এমনতো হতে পারে না।

ইসমাঈল সংশয় দূর করার জন্য সর্বপ্রথম অস্ত্রাগারের দরোজায় ঝুলন্ত তালাটা ভেঙ্গে ফেললো, দরোজা খুলে দেখলো, অস্ত্রাগারে আর একটা অস্ত্রও অবশিষ্ট নেই, অস্ত্রের বদলে রয়েছে সেখানে বেশ কিছু তালেবান সৈন্যের লাশ। গাদাগাদিভাবে পড়ে আছে মৃতদেহ গুলো।

পিলে চমকে গেলো ইসমাঈলের। তাসনিম টিম এর সবাইও নিজেতে কেঁপে গেলো ক্ষণ। তারা দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য রুমগুলোর তালাও ভাঙতে লাগলো। দেখলো, সবগুলো রুমেই কমবেশী লাশ একইভাবে পড়ে আছে। কিন্তু

বড় বিস্ময় এই যে, একটা লাশের গায়েও জখমের কোন চিহ্ন নেই। উপস্থিতরা ভেবে পাচ্ছে না তাদেরকে কি করে হত্যা করা হয়েছে। তারা গুণে দেখলো তিন শ'য়েরও বেশী মুজাহিদ শহীদ হয়েছে।

ইসমাঈলের আর বুঝতে বাকী থাকলো না যে, কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাসনিমও বুঝে গেলো এর রহস্য।

উপস্থিত সবাইই যখন বুঝলো, মার্কিনীদের মদদপুষ্ট সাবেক কমিউনিষ্ট ও স্যাঙ্গাত বাহিনীই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং শয়তানেরা আশপাশেই অবস্থান করছে, তখন তারা আরো সজাগ হয়ে গেলো। জ্বলন্ত বারুদের মতো ঝলকে উঠলো তাসনিম, এর প্রতিশোধ আমাদেরকে নিতে হবে, চলো সামনে। নারায়ে তাকবীর...

সমস্বরে সবাই আল্লাহু আকবার বলে বেরিয়ে আসতে লাগলো সুড়ঙ্গ সীমানার বাইরে।

তারা বেরিয়ে এসে কাউকে আর পেলো না। তবে খবর পেলো, কান্দাহার প্রদেশে পাঁচ সহস্রাধিক মার্কিন সৈন্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেই সঙ্গে মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান সিংহাসনকামীদলের সদস্যও রয়েছে সাত সহস্রাধিক। তারা চিরুনী মিশন চালিয়ে শত শত তালেবান আর বিন লাদেনের অনুসারী বিদেশী আরব ও ইউরো-আমেরিকান মুজাহিদদের মেরে ফেলছে এবং যারা আত্মসমর্পন করেছে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে কান্দাহারের মূল শহরে। কেউ কেউ আবার আত্মসমর্পনের গঞ্জনা এড়াতে আত্মঘাতি অপারেশনের পথ বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছায়।

এরই মধ্য দিয়ে পতন ঘটলো কান্দাহারের। কিন্তু তাসনিম টিম ধরা পড়লো না। তাদের রক্ষিত বিমান গুলো ধ্বংস হয়ে গেছে দেখে কিছু দিন তারা গহীন গুহায় আত্মগোপনের পর আজই তারা সিদ্ধান্ত নিলো, গুহার অন্ধকারে তারা আর থাকবে না, নুসাঈফা, তামান্না ও নাসিমাকে রেখে যেতে চাইলো ইসমাঈল। তাসনিমের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো– নারীর জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে শামিল হওয়া অবশ্যকর্তব্য নয়। আমি চাই এরা এখানেই থেকে যাক।

নুসাঈফা মেহরীন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো- না, ভাইয়া। আমাদেরকে একা ফেলে আপনারা যাবেন না।

তাসনিম বললো– আপনারা কখনোই একা নন। মাউন্টেন তালিবান গার্ডরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন।

তামান্না বললো- তারা তো আছেনই তবুও আপনাদের থেকে পৃথক হতে মন সায় দেয় না।

নুসাঈফা বললো– আমরাও আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই, একই সঙ্গে বাঁচতে চাই, নইলে একই সঙ্গে মরতে চাই।

নাসিমা বললো– হ্যাঁ ভাইয়া, আপনাদের প্রতি জোর অনুরোধ, আমাদেরকেও নিয়ে চলুন।

ইসমাঈল আরো খানিক চিন্তাভাবনা করে অবশেষে বললো- ঠিঁক আছে, চলুন তবে।

অমনি মেয়ে তিনটার মুখচ্ছবিতে খুশীর ঝলক খেলে গেলো।

তারপর অস্ত্রহাতে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো তারা আটজন আত্মপ্রত্যয়ী মুজাহিদ। ঘন টিলা পাহাড়ের পথ পেরিয়ে তারা এগিয়ে আসতে লাগলো কান্দাহার শহরের দিকে।

আর দু'টো বড়ো পাহাড় পেরুলেই শহরের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে তারা। গন্তব্যে যাব্বার আগে, সঠিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য, তারা সবাই ধীর ধীরে উঠে এলো দ্বিতীয় পাহাড়ের শীর্ষচূড়ায়। অমনি তারা ধরা পড়ে গেলো শত্রু পক্ষের চোখে। শত্রুরা প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় সেল, গ্রেনেড, মেশিনগানসহ পজিশন নিয়ে আছে। তাসনিম টিমকে দেখতেই তারা অতর্কিত ভাবে গুলিবর্ষণ করতে লাগলো; শেল, গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে লাগলো। তাসনিম টিম-এর সবাইও পজিশন নিয়ে শত্রু পক্ষের মোকাবেলা করতে লাগলো।

আকস্মিক একাধিক বুলেট এসে বিঁধে গেলো দেলওয়ারের মাথায়। আল্লাহ বলে একটা মাত্র আর্তচিৎকার ছেড়ে নিস্তেজ হয়ে গেলো সে। তাসনিম আবু হিশামকে তাড়া দিয়ে বললো ঃ

– দেলওয়ারকে নিয়ে গুহায় ফিরে যাও। আবু হিশাম দ্বিমতের সুরে বললো- কিন্তু ভাইয়া...

– কোনো কিন্তু নয়, যা বলি তাই করো।

– আচ্ছা ভাইয়া। বলে আবু হিশাম দেলওয়ারকে পাঁজাকোলা করে পাহাড়ের পেছনের দিকে নেমে গেলো।

যুদ্ধ আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিলো। বৃষ্টি ধারায় ঝরতে লাগলো দু'দলের বোমা। রাশি রাশি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগলো আশপাশের পরিবেশ। হঠাৎ একটা গুলি এসে নাসিমার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে গেলো। আল্লাহ নামে চিৎকার

দিয়ে লুটিয়ে পড়লো নাসিমা। নুসাঈফা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। কেঁদে উঠলো তামান্নাও। নাসিমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে তামান্না বললো- কলেমা পড়ো বোন, আল্লাহকে স্মরণ করো। নাসিমা কাতরস্বরে থেমে থেমে বললো-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জয় হোক আফগানিস্তানের, আয় আল্লাহ, জয় হোক সত্য ও সুন্দরের। শেষের কথাটা বলেই নাসিমা মাথাটা ডান দিকে ঈষৎ কাৎ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

নুসাঈফা শব্দ করে কেঁদে উঠলো। তামান্নাও কাঁদলো। এরিমধ্যে আরেকটা বোমা এসে পড়লো তাদের খুব কাছে। চূড়ায় উপস্থিত সবাই কম বেশী আহত হলো। তাসনিম গলাছেড়ে নুসাঈফা ও তামান্নার উদ্দেশে বললো- আপনারা শিগ্‌গির চলে যান, পূর্বের গুহায় অবস্থান করুন।

তৎক্ষণাৎ আরেকটা রকেট এসে বিস্ফোরিত হলো তাসনিম টিম-এর চূড়ায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো নকীব আল জিহাদ, তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো। ইসমাঈল তাসনিমকে বললো- এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চাদপসারনই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। নয়তো আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো।

তাসনিম বললো- শেষ হয়ে যাই দুঃখ নেই। কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে নেমে পিছপা হওয়ার লাঞ্ছনা কী করে সইবো! বীরের মতো মরতে রাজী বন্ধু পালিয়ে যেতে নয়। ইসমাঈল বললো– কিন্তু বন্ধু, আমরা যদি মরে যাই তবে তো আর যুদ্ধ করার কেউ থাকবে না। সবই তো ফুরিয়ে গেলো, সবাই তো শেষ হয়ে গেলো, আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে বন্ধু, এই আমাদেরকেই তো ছিনিয়ে আনতে হবে বিজয়ের সূর্য। এই আমাদেরকেই তো রচনা করতে হবে ইসলামের চির বিজয়ের নব দৃষ্টান্ত। মুখে তাদের কথা বিনিময় চলছে আর হাতে চলছে মেশিনগান। অবিরাম তারা গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। একবার কাত হয়ে, একবার উবু হয়ে, চিৎ হয়ে কখনো কুঁজো হয়ে, বিভিন্ন কৌশলে ।

নুসাঈফা ও তামান্না এখনো নামেনি পাহাড়ের চূড়া থেকে। নুসাঈফা জখম হয়েছে মারাত্মক। তার পরণের হিজাব নিকাব ছিড়ে হাঁটু, মুখ, বাহু, মাথা প্রায় সব স্থানই কম বেশী কেঁটে ফেড়ে গিয়েছে। কপালের কাছ থেকে রক্ত নেমে মুখোচ্ছবি অপরিচিত হয়ে গেছে তার। তামান্নারও লেগেছে কিছু আঘাত। ডান হাত পা সহ ডান গালেরও কিছু অংশে বোমার হালকা বারুদ ও চূর্ন এসে হালকা হালকা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তবে নুসাঈফা যেমনি জ্ঞান হারায়নি কিংবা মনকে দুর্বল করেনি, তামান্নাও তেমনি কঠিন পাহাড়ের মতো নিজেকে শক্ত করে আরো বেশী জিহাদী জজবায় নিজেকে বেধে রেখেছে।

তাসনিম আবার যখন চিৎকার করে বললো- আপনারা যাচ্ছেন না ক্যানো! শিগ্‌গির চলে যান নিচে। যান বলছি... তখনি নুসাঈফা ও তামান্না আল্লাহ নামে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর নাসিমার লাশ ধরে পাহাড়ের পেছনের দিক থেকে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো তারা।

যুদ্ধ চলছে একইভাবে। তাসনিম আর ইসমাঈলও ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। আঘাতের চিহ্ন পড়েছে তাদের শরীরের বিভিন্নঅংশে,এরি মধ্যে একটি বুলেট এসে তাসনিমের পিঠের মাংস ছিঁড়ে ফেড়ে দিলো। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তাসনিম এতটুকু দুর্বল যেনো হলো না। এতটুকু আঘাতও যেনো অনুভূত হলো না তার কাছে। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণ ও আবদ্ধ পরিবেশে সে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

নুসাঈফা মেহরীন ও তামান্না সালওয়া নাসিমার লাশ নিয়ে যে পথ ধরে গুহার পথে চললো, ইসমাঈল ও তাসনিম সেপথে না এসে লঘুপথে গুহার দিকে ছুটলো। ইসমাঈল তো এখানকারই মানুষ, তাই তার এটা জানা যে, কোন পথ ধরে কোনখানে কতো দ্রুত যাওয়া যায় আবার কোন পথ দিয়ে যেতে দেরি হয়।

মাঝারি গোছের একটা টিলার ওপর উঠতে গিয়ে নুসাইফা খুব বেশী পেরেশান হয়ে পড়লো, লাশের একাংশ সে যেনো আর ধরে রাখতে পারছে না। এই বুঝি পড়ে যায়, মধ্য টিলার গা থেকে। তামান্না ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, সেতো নুসাঈফার চেয়ে কম জখম হয়েছে, তাই তার সাথীর লাশের সবটুকু সে নিজের কাছে নিয়ে নিলো। আরো শক্ত হয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। নুসাইফাকে বললো- হেরে যাসনে সই, আয়, জলদি এগিয়ে চল।

নুসাঈফা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করে করে তামান্নার আগে উঠে এলো, তামান্না যখন টিলার শীর্ষের কাছে উঠলো, নুসাঈফা ততোক্ষণে ওপাশ থেকে নামতে শুরু করলো। কিন্তু, তামান্না ঠিক উঠে আসতে পারলো না। তার পা দু'টো ভেঙ্গে আসছে। শরীরের সবটুকু শক্তি যেনো ফুরিয়ে গেছে। ভারি লাশ আরো বেশী ভারি হয়ে তাকে টেনে নিচ্ছে নিচে। শেষ অবদি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না তামান্না। বেসামাল হয়ে পা ফসকে পড়ে যেতেই লাশটা তার হাত থেকে ছিটকে গেলো। নুসাঈফা বলে চিৎকার ছেড়ে তামান্না গড়াতে গড়াতে পড়তে লাগলো নিচের দিকে।

ডাক শুনে নুসাইফা পেছন ফিরে প্রিয় বান্ধবীকে না দেখে আৎকে উঠলো, মুহূর্তেই সে টিলার শীর্ষে ফিরে এসে বান্ধবীকে পড়ে যেতে দেখলো।

চটজলদি নিচে নামবার উদ্দেশে নুসাঈফা দু'পা যখন বাড়ালো, তখনি আবার সামনের দিকে চোখ ফেলে হিমাতংকে থমকে দাঁড়ালো সে। একঝাঁক ভিমরুলের মতো ছুটে আসছে শত্রুবাহিনীর একটি সশস্ত্র দল।

নুসাঈফার বুক পানিশূন্য হয়ে গেলো। সে এখন কি করবে ঠিক ভেবে না পেয়ে ইয়া আল্লাহ্ বলে গুহার দিকে পালানোর উদ্দেশে দৌড়ে ছুটলো শরীরের সবটুকু শক্তি খাটিয়ে দৌঁড়াতে লাগলো নুসাঈফা যেনো শত্রুরা তার নাগাল না পায়, যেনো দলের কাউকে খবর দিতে পারে সে।

শত্রুপক্ষ অজ্ঞান তামান্নার কাছে এসে দেখলো, এই যুবতী মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী। যদিও তার শরীরের একপাশে হালকা হালকা জখমের চিহ্ন আর নাক থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে মুখচ্ছবি অস্পষ্ট, তবুও তাদের মনে হলো, এই অপ্সরী নারী যেনো স্বর্গের ফুল, এমন একটা অনিন্দ্য নারীকে প্রভুপক্ষের কমান্ডারের হাতে তুলে দিতে পারলে তো তাদের কাছে আরো বেশী প্রিয় হওয়া যাবে। কিন্তু, মেয়েটা মরে গেলো না কি।

কমান্ডার নওরোজ তার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো, নেড়ে চেড়ে বললো– বোধ হয় মরেনি। একে নিয়ে চল, সঙ্গে সঙ্গে একটা তাগড়া সৈনিক তামান্নাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চললো।

এদিকে নুসাঈফা গুহায় ফিরে এসে ইসমাঈল ও আবু হিশামের কাছে তামান্নার অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলো। আবু হিশাম কিছু বলতে যাবে তার আগেই ইসমাঈল নুসাঈফার কাছে জানতে চাইলো- তামান্না এখন কোথায়? নুসাঈফা বললো- আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

আবু হিশাম বললো- অবশ্যই।

ইসমাঈল বললো- হ্যাঁ চলুন।

অস্ত্র হাতে তারা তিনজন গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে নুসাঈফার ঝালরযুক্ত দীর্ঘ শাদা ওড়নাটা বেখেয়ালে গুহার ভেতর পড়ে রইলো।

নির্ধারিত টিলার চূড়ায় ফিরে এসে তারা কাউকেই কোথাও দেখলো না। এখানে না আছে তামান্না, না আছে নাসিমার লাশ আর না আছে শত্রু বাহিনীর কোনো চিহ্ন।

নুসাঈফা বিস্ময় বেদনায় কেঁপে উঠলো। তাহলে গ্যালো কোথায় ওরা। ওদেরকে নিয়ে শয়তানেরা কোন দিকে হারিয়ে গেলো। কিন্তু তামান্নাকে যে আমার চাই। তামান্না, প্রিয় বান্ধবী আমার! আমার হৃদয়ের আত্মীয়।

গলা ভেঙ্গে ঈষৎ শব্দে কাঁদতে লাগলো নুসাঈফা। ইসমাঈল বললো- অস্থির হবেন না, তামান্নাকে আমরা খুঁজে বের করবোই।

এরপর তারা ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

এদিকে তাসনিম জ্ঞান ফিরে পেতেই যুদ্ধের কথা মনে হলো তার। মনে হলো এখনো সে যুদ্ধ করছে। কিন্তু, তার হাতের মেশিনগান কই! তড়াক করে ফিরতে চাইলো তাসনিম। কিন্তু পারলোনা, সমস্ত শরীরে মর্মরে ব্যথা বেদনায় জ্বালা পোড়ায় কঠিন টান অনুভব করে কাতর স্বরে আল্লাহ বলে মাথাটা আবার মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে দেখলো, সে একটা গভীর গুহায় শুয়ে আছে। গুহাটা তার পরিচিত। এর আগে একাধিক দিন এ গুহায় তারা অবস্থান করেছে। কিন্তু তার সঙ্গী সাথী কোথায়?

তাসনিম থেমে থেমে নড়াচড়া করার চেষ্টা করে অবশেষে সফল হলো। ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ ফিরতে লাগলো। পেছনের দিক ফিরতেই দেখলো, দেলওয়ারের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আর কেউ এখানে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু, গ্যালো কোথায় সবাই। তাহলে কি যুদ্ধ এখনো চলছে। আর যুদ্ধ যদি চলেই তবে তো আমি গুহায় থাকতে পারিনা।

তাসনিম ইয়া আল্লাহ বলে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলোনা। কিছুটা সোজা হতেই ধড়াস করে পড়ে গেলো মাটিতে। আঘাতটা সামলে নেয়ার পর তার চোখে পড়লো নুসাঈফার ফেলে যাওয়া সেই ওড়নাটা। তাসনিম অবাক হলো– নুসাঈফার তো এখানে থাকার কথা, তামান্নাই বা কোথায়!

কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না তাসনিম। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না, ক্রমশঃ মনে হচ্ছে, আরো বেশী গুরুতর হয়ে যাচ্ছে তার শারীরিক অবস্থা।

হঠাৎ তাসনিমের কেন জানি মনে হলো, সে হয়তো আজ মরেও যেতে পারে। এ মুহূর্তে ওস্তাদ খালিদ বিন আতাউল্লাহকে মনে পড়লো তার। মনে পড়লো শায়লার কথা। প্রাণপ্রিয় মা জননীকেও মনে পড়ে গেলো। মনে হলো, আর কোনদিনই যেনো এদের কারো সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু কারো জন্য যে কিছু করা হলো না। একটা দেশেরও মুক্তি সে ছিনিয়ে আনতে পারলো না। তবে এই অপারগতার গ্লানি নিয়ে মরেও যে শান্তি পাবে না তাসনিম।

তাসনিমের দু'চোখের কোণে রাশি রাশি অশ্রু মুক্তোর মতো চিক চিক করে উঠলো। আতাউল্লাহকে কিছু শেষ কথা বলতে চাইলো তাসনিম। কিন্তু ওয়ারলেস সেটটি খুঁজে হাতের কাছে পেলোনা। আলতো আলতো হাত বাড়িয়ে

নুসাঈফার ওড়নাটা হাতে তুলে নিলো তাসনিম। দেখলো, বিশাল সাদা ওড়নার কিছু কিছু অংশ রক্তে রাতুল হলেও প্রশস্ত জমিন সফেদই রয়ে গেছে।

দেলওয়ারের লাশের দিকে একটা খেঁজুর ডালের ছোট্ট মেসওয়াক চোখে পড়তেই তাসনিম ওড়নাসহ সেদিকে এগিয়ে এলো। মেসওয়াককে কলম বানিয়ে স্বীয় দেহের রক্ত দিয়ে সাদা ওড়নায় নীচের কথাগুলো লিখতে চেষ্টা করতে লাগলো–

পরমশ্রদ্ধেয় আম্মাজান,

আজ আপনাকে খুব মনে পড়ছে, আপনার অপার মহিমা ভরা চিরচেনা নিষ্পাপ বদনখানি বেশী দেখতে ইচ্ছে করছে আম্মাজান, আম্মাজান, সেভাবেই দেখতে ইচ্ছে করছে পবিত্র মাটি আমার প্রিয় জন্মভূমির অপরূপ শ্যামলিমা। কিন্তু মা, জাগতিক যতো কিছু যা কিছু পার্থিব টাকা কড়ি, গাড়ী বাড়ি, রাজ্য পাট, বাহাদুরী এসবের কোনোটাতেই আমার কোনো মোহ নেই, আমার যতো মোহ তা সবি একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে। আল্লাহর ঘোষণার প্রতিটি মুসলমানের জন্য জিহাদ ফরয, সময়ের প্রয়োজনে আমি আজ শারীরিক জিহাদে অবস্থানরত। আপনার কাছে আমার এই মিনতি আম্মাজান আপনি আমার ছোট ভাইবোন গুলোকেও এই শিক্ষাই দিয়ে যাবেন, তারা যেনো তাদের সবটুকু ভালোবাসা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দ্যায়। আর আপনি কখনো চিন্তা করবেন না মা। এই পৃথিবীতো দুদিনের। এ ধরাতো ক্ষণিকের মিছে খেলাঘর। মরতে তো একদিন হবে। কেউতো টিকে থাকেনি চিরদিন এই পৃথিবীতে। আর মৃত্যু যদি এতোই সত্য হয়ে থাকে মা, সত্যিই যদি এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হয়, তবে সে চলে যাওয়া অলসভাবে বিছানায় শুয়ে ক্যানো হবে মা, মা আমি আল্লাহর রাহে এ জীবন উৎসর্গ করে দিলাম, মা। আপনি দোয়া করবেন, আল্লাহর পথে কোরবান হয়ে এ জীবন ধন্য করার তৌফিক প্রাপ্ত যেনো হই,আপনি বিলাপ করবেন না আম্মাজান, আমার সন্তানহারা মা জননী, আপনি শুধু জেনে রাখবেন- শহীদরা অমর আর অমরেরা কখনো মরে না। আর জানবেন, আপনার প্রতি আমার যে নির্মল নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পবিত্র মাতৃভক্তি রয়েছে তার সূধা একদিন আপনার বেহেশতের ঠিকানায় আমাকে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে, মা।

– আপনার তাসনিম।

চিঠিটা কোনরকম লিখে তাসনিম হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে দু বাহু দিয়ে ওড়নাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলো।

এদিকে ইসমাঈল, আবু হিশাম ও নুসাঈফা সম্ভাব্য অনেক জায়গা খুঁজে খুঁজে তামান্নার কোন হদিস করতে না পারলে ইসমাঈল অবশেষে বললো- আপনারা গুহায় ফিরে যান। আমি তামান্নার একটা বিহিত করে তবেই ফিরবো।

আবু হিশাম বললো- তাই কী ঠিক হবে, ভাইয়া! আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

ইসমাঈল বললো– ওদিকে তাসনিম ভাইও রয়েছে। তার কাছে ফিরে যাওয়াই আপনাদের উচিত হবে। আমিও কিছুক্ষণের ব্যবধানে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ।

ইসমাঈল গোপন পথ দিয়ে ছুটে যেতে লাগলো কান্দাহার শহরের দিকে আর নুসাঈফা ও আবু হিশাম গুহার পথে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ততোক্ষণে তাসনিম আল্লাহ নামে বেরিয়ে এসেছে গুহা মুখের বাইরে। আচমকা একটা ঝাপটা বাতাস এলে সে বাতাসে তাসনিম মায়ের কাছে লেখা চিঠিটা উড়িয়ে দিলো। কিছুদূর উড়ে গিয়ে বিশাল ওড়না, বড়ো একটা আখরোট গাছের ডালে জড়িয়ে উড়তে লাগলো। মায়ের কাছে লেখা চিঠিটা মা যদিও নাইবা পেলেন, তবুও মনের কথাগুলো লিখতে পেরেছে, উড়িয়ে দিতে পেরেছে এ পরিতৃপ্তির পরিধিও বা কম কিসে।

গুহা মুখে বসে তাসনিম ভেবে যাচ্ছে, সে কি গুহার অভ্যন্তরে ফিরে যাবে, না-কি সঙ্গীদেরকে খুঁজে পাবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করবে কোন পথে। এরিমধ্যে নুসাঈফা ও আবু হিশাম সেখানে উপস্থিত হলো। তাসনিম আরো আগে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ততোক্ষণে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেখে তারা দুজনেই খুশীতে বাগ বাগ। দুজনের মুখ থেকেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলো আলহামদু লিল্লাহ।

তারপর নুসাঈফা তাসনিমের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলো। তামান্নার কথা জানালো। তামান্নার নিখোঁজ সংবাদ শুনতেই তাসনিমের বুকের ভেতরের পানিভর্তি গেলাসটা ঝলাৎ করে উঠলো, অকপটে বললো- আমিও যাবো, তামান্নাকে খুঁজে বের করবো।

আবু হিশাম বললো- ইসমাঈল ভাই আগে ফিরে আসুন। দেখি কি সংবাদ নিয়ে আসেন তিনি।

তাসনিম বললো- তবে তাই হোক।

ইসমাঈল ফিরে এলো বিকেল পাঁচটার দিকে। গোপন সূত্রে তামান্নার হদিস নিয়ে এসেছে সে। সঙ্গীদেরকে জানালো এখন পর্যন্ত তামান্না কান্দাহার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে খুব বেশী আহত হয়নি সে। সাময়িক চিকিৎসার পর এখন মোটামুটি সুস্থ। তবে আজই তাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। কান্দাহার ষ্টেট ব্যাংক রেষ্ট হাউজে প্রভুপক্ষের কমাণ্ডারের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে হাজির করা হবে।

একথা শোনামাত্রই তাসনিমের মাথায় যেনো আগুন ধরে গেলো। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে হুংকার ছাড়লো সে, নাহ! আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্তও আমি তামান্নার এ সর্বনাশ হতে দেবো না।

ইসমাঈল বোঝাতে চাইলো, বন্ধু তুমিতো এখনও পুরোপুরি সুস্থ নও। তাছাড়া আমরা দলেও ছোট।

তাসনিম বললো- প্রায় সময় আল্লাহ ছোট দলটাকেই জিতিয়ে দেন আর আমি তো সুস্থই আছি। কোথায় সেই ব্যাংক ভবন, আমি যাবো সেখানে।

আবু হিশাম বললো- আপনি গেলে আমরাও যাবো সেখানে। কিন্তু, আমরা তো ধরা পড়ে যেতে পারি, ভাইয়া। তাসনিম বললো- ধরা পড়লেও অসুবিধা নেই। আমরা তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। আল্লাহ যদি আমাদের ক্ষতির ফায়সালা না করেন, তবে ক্ষতি সাধনের সাধ্য আছে কার। চলো সবাই, নারায়ে তাকবীর...

'আল্লাহু আকবার'

কয়েকবার শ্লোগান দিয়ে তারা কান্দাহার শহরের দিকে গোপন পথে এগিয়ে চললো।

এদিকে তামান্না সালওয়া যখন আরেকটু স্বাভাবিক হয়ে উঠলো, তখন আমেরিকার মদদপুষ্ট বাহিনীর ৩ সদস্য তামান্না সালওয়াকে পরিকল্পনা মোতাবেক সাততলা ব্যাংক ভবনে নিয়ে এলো। মার্কিন কমাণ্ডার মুরলুই ৬ তলার ডান পাশের ফ্লাটে অবস্থান করছে। ইতোপূর্বে উপঢৌকন হিসেবে আরো ক'টি সুন্দরী তরুনী দেয়া হয়েছে তাকে। তামান্না সালওয়াকে পেয়ে মুরলুই যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলো। মুহূর্তের তর তার সইছে না, তামান্নাকে পৃথক রুমে এনে দরোজা ভেজিয়ে দিলো সে। তারপর সে তার তিন করিগকে নিয়ে হিংস্র হায়েনার মতো তামান্নার ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো তামান্না তখন হাত বাড়িয়ে বললো– খবরদার শয়তান! আমাকে স্পর্শ করবি না।

শয়তানরা মদের বোতল খুলে বললো– শুধু স্পর্শই নয় সুন্দরী, তোমাকে নিয়ে আজ সব কিছুই হবে।

– নাহ! এ দেহে প্রাণ থাকতে তোরা তা পারবিনা।

– পারবো, পারবো, আমরা অনেক কিছুই পারি, এসো, আপোষেই এসে যাও, সব কিছু খুলে দাও, সুন্দরী... আরেক পেগ মদ গিলে মুরলুই ভিলেনের মতো তামান্নার দিকে এগুচ্ছে, তামান্না এক পা দু পা করে পেছনে সরছে আর বলছে পৃথিবী উল্টে যাবে তবু তোরা আমার কিছু করতে পারবিনা, জালিম, তোদের হাতে আমি কিছুতেই ধরা দেবো না।

– ধরা দিবিনা... বলেই মুরলুই ভয়ঙ্কর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তামান্নার ওপর। শরীরের সবটুকু শক্তি খাটিয়ে কবুতরের মতো মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরতে চাইল। তারপর কু বাসনা চারিতার্থ করতে আঁচড়ে খামচে কামড়ে তার সারাদেহ ক্ষত বিক্ষত করতে চাইলো। কিন্তু মজবুত ঈমানের তরুণী তামান্না সালওয়া বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে প্রতিবারই তাকে নিরাশ করে দিলো। তামান্না তার শরীরে এই হিংস্র হায়েনার এতটুকু স্পর্শই লাগতে দিলো না। হায়েনারা বলে যেতে ল 'লো– আমাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি কোরো না, পাখিটি। আমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো, তবেই তুমি বেঁচে থাকবে।

তামান্না বললো- তোরা ভুলে যাচ্ছিস শয়তান, আমার শরীরে মুসলমানের রক্ত। আর সত্যিকারের মুসলমান নারী জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইজ্জত নয়।

এরপর তামান্না যখন নিজেকে আর রক্ষে করতে পারছিলো না তখনি ক্যারাটের কৌশলে মুরলুইর যৌন প্রদেশে কষে একটা লাথি মেরে রাস্তার দিকের কাচের জানালা ভেঙ্গে আল্লাহু আকবার বলে নিচে লাফিয়ে পড়লো সে।

দূর থেকে একটা মেয়ে মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে পোশাকের চিহ্নে তাসনিম টিম নিশ্চিত হলো, এটা তামান্না ছাড়া আর কেউ নয়। বলা বাহুল্য ইসমাঈলও এখন তাসনিম টিমএর সদস্য।

তারা চারজন হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে সমতালে দৌড়ে এলো পড়ে যাওয়া মেয়েটাকে কাছে। দেখলো, তাদের ধারনাই ঠিক। এই মেয়েই তামান্না সালওয়া, যাকে তারা খুঁজছিলো।

কিন্তু তামান্না বেঁচে নেই। মাথা থেকে তার ঘিলু খুলে ছিটকে পড়েছে বেশ দূরে। রক্তে রেঙে গেছে তার শরীর।

তারা চারজন তামান্নাকে ধরে তুলতে উদ্যত হলো। তখনি তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ঠেকে গেলো ভারি মেশিনগানের মুখ। তারা আৎকে উঠলো। সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য তাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো না তাদের। বিরোধী সৈন্যরা তাদের মেরে মেরে ঠেলে ধাক্কিয়ে নিয়ে চললো গাড়ি মাঠের দিকে।

এখানে অসংখ্য কন্টেইনার রয়েছে। পরাজিত তালেবান তথা বিন লাদেন সমর্থক বিদেশী সৈন্যদের ধরে ধরে রাখা হয়েছে এই নিশ্ছিদ্র কন্টেইনারে। এক একটা কন্টেইনারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনকে ভরে সবগুলোই তালাবদ্ধ করে দিয়েছে ওরা। আটকে পড়া মুজাহিদরা বাতাস না পেয়ে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে অনেকেই ইতোপূর্বে প্রাণ হারিয়েছে। এখনো প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কেউ কেউ।

তাসনিম, নুসাঈফা, আবু হিশাম ও ইসমাঈলকেও পুরে দেয়া হলো এমনি এক কন্টেইনারের ভেতর। তারপর সবগুলো গাড়ি ছেড়ে দেয়া হলো বিরান ভূমির উদ্দেশে।

তাসনিম টিম-এর কন্টেইনারে তারা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই। মিনিট পাঁচেকের ব্যবধানে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। তাসনিম ও আবু হিশাম তাদের উভয়ের পরনের জুতোয় লুকিয়ে রাখা ইস্পাতের ধারালো মজবুত দু'টো চাকু বের করে কন্টেইনারের গায়ে আঘাত করতে লাগলো। কিন্তু এত বিশাল পুরু লোহার কন্টেইনারের গায়ে সে আঘাত কিছুই না। ইসমাঈল দরোজা ধরে জোরে জোরে ধাক্কাতে লাগলো। ইতোমধ্যে নুসাঈফা বড়ো ছটফট শুরু করে দিয়েছে। তার গলা বুক ক্রমশঃ সাহারা হয়ে যাচ্ছে। সাহারা হয়ে যাচ্ছে অন্যদেরও বুক। মনে হচ্ছে, শুধু পানিটাই বুঝি সত্য। তারা কেউই যেনো কোনো কালে এতটুকু পানি পান করেনি। জগতের সবটুকু পানি খেয়ে ফেললেও তাদের তৃষ্ণা বুঝি আজ মিটবে না। কিন্তু, পানি কোথায়! এই পানির জন্যই তো বেঁচে থাকে পৃথিবী। এই মাটির গড়া শরীরটা পানির পরশ ছাড়া কী করে বেঁচে থাকে কার! কারবালায়ও তো পানি পানি হাহাকারে মরে গেছেন কতোজন। আজ তারাও বোধ হয় পানির জন্য হাহাকার করে সেভাবে মরে যাবে। কিন্তু, তাদেরকে তো মরে গেলে চলবে না, তাদেরকে তো হেরে গেলে চলবে না, তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। এ পৃথিবীকে এই ক্ষ্যাপা পাষণ্ড ও উন্মাদ জালিম শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

জিদে প্রতিহিংসায় মুহূর্তেই তারা সবাই শক্ত পাহাড়ের মতো মনোবল নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আল্লাহ নাম মুখে নিয়ে তারা সবাই এক সঙ্গে বদ্ধদরোজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।

কিন্তু ফল হলো না কোনই। কঠিন লোহার দরোজাটা এতটুকু ঢিলে ঢালা হলো বলেও, মনে হলো না। নুসাঈফা পানির পিপাসা আর ধরে রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি একটু পানি পান না করতে পারে, তবে সত্যিই বুঝি সে মরে যাবে। দু'হাতে বুক চাপড়িয়ে পানি! পানি! করে করে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো নুসাঈফা। তাসনিম তার দু'বাহু ধরে মুখটাকে মুখের কাছে বাড়িয়ে দিলো।

– নিন সাথী, পানি পান করুন। জিবটা বের করে দিলো তাসনিম। নুসাঈফা তাকে জড়িয়ে ধরে জিব চুষে চুষে মরণ পিপাসা মেটাতে লাগলো।

আবু হিশামও পানির পিপাসা আর এতটুকু সইতে পারছে না– পানি চাই, পানি... চিৎকারে পুরো আফগানভূমি যেনো কাঁপিয়ে তুললো সে । আর এই হাহাকার সইতে পারলো না ইসমাঈল। আবু হিশামের হাতের ছুড়ি কেড়ে নিয়ে স্বীয় বুক ক্ষতবিক্ষত করে তাজা রক্তের ঝরণা ধারা বইয়ে দিয়ে বললো- নাও বন্ধু, পানি খাও, পানি, আবু হিশাম রক্তের ঝরনায় চুমুক লাগিয়ে অনন্তকালের সবটুকু পিপাসা মেটাতে লাগলো।

তা দেখে তাসনিম নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। না... বলে আর্তচিৎকার ছেড়ে বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে উঠলো সে, আল্লাহু আকবার বলে এমন জোরে কন্টেইনারের দরোজায় এক লাথি মারলো যে, দরোজার কপাট দুটো কোথায় ছিটকে পড়লো তার হদিসই রইলো না। কন্টেইনার ও কাৎ হয়ে গেলো একদিকে। গাড়ী তার ভারসাম্য আর রাখতে পারলো না। চলতে চলতেই পাহাড়ী পথের ডান দিকে কাৎ হয়ে পড়লো কন্টেইনার মুভার। কন্টেইনার ছিটকে গিয়ে উঁচু পাহাড়ী পথ থেকে পড়ে গেলো ৩০০ ফুট নিচে দুর্গম বিশাল খাদ গর্তের ঘনটিলা, বন রাজীতে। আর পড়ে যাওয়া মুভারে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ আগুন।

শত্রু পক্ষের প্রহরীরা গাড়ী থামিয়ে ব্যাপারটা অবলোকন করতে লাগলো। নিচে তাকিয়ে তারা কন্টেইনারটা দেখতে পেলো না। বড় বড় ঝোপ ঝোপের লতা গুল্ম ডালপালার আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেছে কন্টেইনার তা কে জানে। তবে শত্রুরা নিশ্চিত হলো, এত উপর থেকে পড়ে কন্টেইনারের ভেতরের কেউ আর বেঁচে নেই। তবুও তারা হাত আন্দাজে কয়েক ডজন গ্রেনেড ফেললো গুহার বিভিন্ন অংশে। তারপর তারা চলতে লাগলো পূর্বের মতো।

বিরান ভূমিতে ফিরে এসে শত্রুরা সবগুলো কন্টেইনারের মুখ খুলে একে একে বের করলো শত শত লাশ। বন্দিদের কেউই আর বেঁচে নেই। নুসাঈফা ও

আবু হিশামের মতো আকুল আকুতিতে কতোজন কতো মানুষের লালা আর রক্ত খেয়েও হয়তো বাঁচতে চেয়েছিলো। কিন্তু, নিয়তি তাদের এ পুরী থেকে নিয়ে ও পুরীতে রাখলো।

এ বিরান ভূমির পাঁচ সাত মাইল সীমানায় কেউ কখনো আসেনা। ঘনটিলা পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিশাল স্থান জুড়ে সমতল ভূমি। অপার রহস্যময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কী অপরূপ মহিমা, এই যেখানে পাহাড়, এই সেখানের কাছে এত সমতল।

সমস্ত লাশগুলো বিরান ভূমিতে স্তুপাকারে ছড়িয়ে দেয়া হলো। তারপর একাধিক বুলডোজার চালানো হলো সমস্ত লাশের ওপর। মানুষের হাত পা, মাথা, চোখ সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সমান হয়ে মিশে গেলো মাটির সঙ্গে। আর এমন জঘন্য কাজ সম্পন্ন করে উল্লাসে অট্টহাসি হাসতে লাগলো নরপশুর দল।

এদিকে তাসনিম টিম-এর তিনজনকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলেও ইসমাঈল বেঁচে নেই। নুসাঈফা ও আবু হিশাম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো। তাসনিম তাদের সবাইকে কন্টেইনার থেকে বের করে সেবা যত্ন দিয়ে দুজনারই হুশ ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। এরপর তারা তিনজনে মিলে ইসমাঈলকে দাফন করে কোন একটা উপায়ের খোঁজে পথ ধরলো।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাসনিম টিম বিশাল একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথের হদিস পেয়ে গেলো। তারা আল্লাহ নামে নেমে পড়লো সে পথে। কিন্তু যতোই সামনে এগোয় পথ আর ফুরায়না।

আরো কিছুদূর এগিয়ে এসে তারা দেখলো, সুড়ঙ্গ পথের ভেতরে মাঠের মতো একটা জায়গায় বেশ ক'টা দ্বিতল ভবন। গোটা তিনেক জীপ মাইক্রোবাসও রয়েছে বড়ো ভবনটার কাছে। কিন্তু লোকজনের কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না কোথাও।

তারা তিনজন একটা জীপের কাছে এসে দেখলো, সে জীপের সবকিছুই ঠিক রয়েছে এবং তেলও রয়েছে পর্যাপ্ত। এরপর তারা বড় ভবনের প্রধান ফটকটা ভেঙ্গে ফেললো। দেখলো এটা একটা খাদ্যগুদাম। নানান রকম ফলের পাশাপাশি অসংখ্য বস্তা আটা-গমও রয়েছে গুদামে।

আরেকটা রুম খুলে তারা দেখলো, সে রুমে রয়েছে নানান ভারি অস্ত্র। তারা খুশী হলো। এখানেই বেশ কিছুদিন তারা খেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে, আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে লেগে থেকে শরীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ফেললো।

কিন্তু, এখন আর তারা এখানে থাকতে চায় না, তারা যেতে চায়। কিন্তু কোথায় যাবে তারা। কি ভাবে যাবে! তাদের ভেতরে আরেকটা সংশয় তথা ঘোর রহস্যও রয়ে গেছে। আর তা হলো, এই যে গাড়ীগুলো এখানে আছে, এই গাড়িগুলো সুড়ঙ্গ পথের মুখ থেকে আসার কোন রাস্তা নেই। গাড়ীগুলো নিশ্চয়ই ভেতরের দিক থেকে এসেছে। কিন্তু, কতোদূর থেকে এসেছে, কতো দূর চলে গেছে এ সুড়ঙ্গ পথ কে তা জানে। না কি আবার কখন কে ফিরে আসে এ সুড়ঙ্গ পথ ধরে।

আরো ক'দিন অপেক্ষা করার পর তাসনিম টিম কারোর দেখা যখন পেলো না, তখন তারা এই বিশাল সুড়ঙ্গ পথের শেষ দেখতে চাইলো। সিদ্ধান্ত স্থির করে তারা সবচে দৃষ্টি নন্দন জীপটায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য খাবার আর বেশ কিছু অস্ত্র সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ভরে আল্লাহ নামে এগিয়ে চললো এই বিশাল ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গ পথের গভীরের দিকে।

কতোদিন, কতোরাত অতিবাহিত করে তিন সদস্যের তাসনিম টিম এক সময়ে এসে থেমে গেলো সুড়ঙ্গ পথের শেষ সীমানায়। এপাশের সুড়ঙ্গ মুখও ওপাশের সুড়ঙ্গ মুখের মতো ঝোপঝাড়ে অস্পষ্ট। তাসনিম ভাবলো, সময়ের অপচয় না করে বেরিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

গাড়ি ছেড়ে নেমে আসতেই তারা ডানপাশে, সুড়ঙ্গের গায়ে বিশাল কিছু ত্রিপলের পর্দা দেখতে পেলো, রহস্য উদঘাটন করতে তারা তিনজন একপাট পর্দা তুলে দেখলো, চমৎকার একটা মহল। কিন্তু, মহলে কোনো লোকজন দেখলো না। তারা আল্লাহ ভরসা বলে মহলে ঢুকে পড়লো।

মহলের বামপাশের দরোজা খুলে দেখলো, এটা একটা পার্সোনাল রেস্ট রুম। ড্রেসিং রুমে আলখাল্লা জাতীয় কিছু পোশাক দেখে তাসনিমের ভেতরটা হেসে উঠলো- আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

নুসাঈফা বললো– অবশ্যই। নচেৎ এই পোশাক পরেই বেরুতে হতো।

এরপর তারা যে যার পছন্দ মতো পোশাক নিয়ে তিনজন তিন জায়গায় গিয়ে তা পরিধান করলো।

মহল থেকে বেরিয়ে এসে তাসনিম টিম পাশের আরেকটা পর্দা তুলে দেখলো, এটা একটা পার্কিং লট, হরেক রকম গাড়ি রাখা আছে এখানে। পরের পর্দা তুলে দেখলো, এখানে বেশ ক'টা ভবন রয়েছে। চতুর্থ নাম্বার পর্দা তুলে দেখলো, এটা একটা ট্রেনিং মাঠ, পঞ্চম পর্দা তুলে দেখলো, এর একপাশে অস্ত্রাগার, একপাশে খাদ্য গুদাম আরেকপাশে ঔষধাগার।

তাসনিম টিম বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, এসবের সত্ত্বাধিকারী কে বা কারা হতে পারে। তারা আবার ফিরে আসবে না তো এখনি। তবে তো আগে ভাগেই আমাদেরকে সেইফ হতে হয়। সঙ্গীদেরকে তাড়া দিয়ে তাসনিম বললো– চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গীদ্বয় বললো অবশ্যই।

তিনজন তিনটা সাব মেশিনগান হাতে নিয়ে আল্লাহর নামে বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ পথের বাইরে। দেখলো, এখন তারা বিশাল এক গুহায় অবস্থান করছে, যেখান থেকে দিনের আলো দেখা যায়। গাড়ি ট্যাংকের শব্দ শোনা যায়। তাসনিম সঙ্গী দুজনকে বললো– না জানি আমরা কোন দেশে চলে এসেছি।

আবু হিশাম বললো– আমাদেরকে গুহা থেকে বেরুতে হবে ভাইয়া।

তাসনিম বললো– অবশ্যই।

তারপর তারা তিনজন পাহাড়ী গুহার গা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো দক্ষতার সাথে।

গুহা থেকে পরিপূর্ণভাবে উঠে আসার আগে তাসনিম তার মাথাটা সন্তর্পণে গুহার এক বিঘত ওপরে উঠালো। দেখলো, প্রশস্ত রাজপথের পাশে বিভিন্ন শহুরে প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বড় বড় সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের নিচে লেখা রয়েছে– ইরান-আফগান সীমান্তবর্তী এক শহরের নাম। গুহার বাইরেই ওদের স্বাগত জানালো শায়খ বিন লাদেনের প্রতিনিধি। বললেন, এখানকার এক গোপন এয়ারোড্রাম থেকে একঘণ্টা পর একটি ছদ্মবেশী বিমান জেরুজালেমের উদ্দেশে আপনাদের নিয়ে রওনা হবে। আপনারা তৈরী হয়ে নিন। তাসনিম আনন্দে আটখানা হয়ে যায়, তবে কি আমরা সত্যিই সেই জেরুজালেমে চলেছি, যে জেরুজালেম ইসলামের তৃতীয়তম পবিত্র স্থান। তাসনিম বিমান থেকে নেমে নিজের পরিকল্পনা সাথীদেরকে জানাতেই সাথীরা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলো। সবার মুখ থেকেই এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো– আলহামদু লিল্লাহ।

তাসনিম বললো- আমাদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হুট করে বেরিয়ে পড়া ঠিক হবে না।

আবু হিশাম বললো- জ্বি ভাইয়া, সব কিছু ভেবে চিন্তে করতে হবে।

নুসাঈফা বললো- অসুবিধা হবে না। এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। আমি এর আগেও এসেছি জেরুজালেম। তাসনিম বললো– কিন্তু, আমরা তো জিহাদরত, বাসাবাড়ির মায়ায় আমরা জড়াতে চাই না।

এরপর তাসনিম একটু থেমে নুসাঈফার উদ্দেশে বললো, তবে হ্যা, আমার মনে হয় আপনি আপনার আত্মীয়ের বাসায় ফিরে গেলে মন্দ হয় না।

আবু হিশাম বললো- হ্যাঁ, আপনি চাইলে সেখান থেকে দেশেও ফিরে যেতে পারবেন। নুসাঈফা বললো আপনাদেরকে ছেড়ে আমি যাবো না। তবে ক্ষণিকের জন্য সেখানে বেড়িয়ে আসার অনুমতি চাইবো। তাসনিম বললো অনুমতি অবশ্যই পাবেন এবং আমরাই আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

আবু হিশাম বললো– অস্ত্র নিয়ে বের হওয়াটা ঠিক হবে কি-না, ভাইয়া।

ভাইয়া বললো– আমিও তাই ভাবছি।

নুসাঈফা বললো- অস্ত্রগুলো আপাততঃ লুকিয়ে রাখলে মন্দ হয় না, আর আমরা তো যাবে। রাত্রে। তাসনিম বললো- গুড আয়ডিয়া, সেটাই ভালো হবে।

প্রথম প্রহর রাতেই জেরুজালেমের রাজপথে বেরিয়ে এলো তারা তিনজন। তবে অস্ত্র তারা রেখে এলো না, আলখাল্লার ভেতরে পিঠের সাথে সমরাস্ত্র এমন ভাবে বেঁধে নিলো যে, এতটুকু চিহ্ন তার রইলো না।

নূসাঈফার মামা বাড়ি জেরুজালেমের আট মাইল দক্ষিণে বেতলে হেম ও জেরুজালেমের মধ্যিখানের সীমানায়। নুসাঈফা দেখলো, কী আশ্চর্য যে তারা তার সেই কাংক্ষিত স্থানেই উপস্থিত রয়েছে। তাদের অবস্থান থেকে নুসাঈফার মামা বাড়ি দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটারের মতো। নূসাঈফা খুব খুশী হলো।

লক্ষকোটি শোকরিয়া জানিয়ে যাচ্ছে তাসনিম ও আবু হিশাম। তারা যতোবার ভাবে, সত্যিই তারা জেরুজালেমের মাটিতে পা রেখে হাটছে, ততোবারই অপার মহিমাময় পরম দয়াল দাতা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রশংসা ভালোবাসায় বুকের তল টই টম্বুর হয়ে উঠেছে তাদের।

তাসনিম জানে, শাম দেশ হলো, লেবানন সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। এই ফিলিস্তিনের বুকের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে জেরুজালেম। ফিলিস্তিনের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে আরব রাজ্যের সীমানায় কিলোমিটারের হিসেবে এই দেশের বর্তমান আয়তন ২৭ হাজার, জনসংখ্যা ৬০ লাখ। দেশটির ভূপৃষ্ঠে ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশ জর্ডান, দক্ষিণে সিনাই উপত্যকা ও মিসর, পশ্চিমে ভূ মধ্য সাগর এবং উত্তরে সিরিয়া ও লেবানন। ফিলিস্তিনের জনগণ মজলুম, তারা অব্যাহতভাবে লড়াই করে যাচ্ছে। তাদের পুরনো নিজস্ব ভূখণ্ড ফিরে পাবার জন্য।

এই ফিলিস্তিনের আরো অনেক কথাই জানা আছে তাসনিমের। তিনটি ধর্মেরই ধর্মীয় বর্ণনা মতে, হযরত আদম (আ.) নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.),

ইসহাক (আ,), দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) সহ প্রথম সারির অনেক নবী-রাসূলের কর্মস্থল ছিলো এই ফিলিস্তিন। হাদীসের ঘোষণামতে সম্ভবতঃ এদেশই হবে হাশর ময়দানের ভিত্তিভূমি।

তাসনিম এও জানে যে, ৬২০ সালের রজব মাসের ২৭ -এর রাতে মহান আল্লাহর পরমবন্ধু, মানুষের একমাত্র মহান প্রেমিক সাইয়্যেদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, রহমাতুল্লিল আলামীন প্রাণ প্রিয় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে বিদ্যুতের চেয়েও হাজারগুণ বেশী গতিসম্পন্ন অপূর্ব অনুপম বোরাক মোবারকে আরোহন করে এই জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) সহ সমস্ত আম্বিয়া ও রসূলগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সালাম বিনিময় করেন এবং এই মসজিদে নিজে ইমাম হয়ে তাদের সকলকে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করেন। হুযূর পাকের পেছনে সে রাতে নামায পড়েছিলেন ১লক্ষ কিংবা ২ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গাম্বর, আসমান ও জমিনের সকল ফেরেস্তা। এ ছাড়াও ইতিহাস জুড়ে ইসলামের আরো কতো বীর সেনানির পদচিহ্ন পড়েছে এই পবিত্র মাটিতে। সেই মাটির উপর তাসনিম তার সাথীদেরকে নিয়ে হাঁটছে, এ যে কতো বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

নুসাঈফা মেহরীনের মামা বাড়ি মাঝারি গোছের একটা টিলার ওপর। দ্বিতল বাড়ি। এই এলাকার আমীরের দায়িত্বে আছেন নুসাঈফার মামা জিহাদুল হাকিম সাহেব। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ ছাড়ালেও শারীরিক শক্তিতে এখনো তিনি নওজোয়ান। দুটো ছেলে মেয়ে, বড় মেয়ে নাহিন তাবার বয়স সতেরো আর ছোট ছেলে ইমরানের বয়স এগারো। এ বাড়িতে আরো দু'জন কাজের লোক থাকে, তাদের একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা, বলা বাহুল্য, তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী এবং এ বাড়ির পুরনো ভৃত্য।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে নুসাঈফা তাসনিম ও আবু হিশামের উদ্দেশ্যে বললো- আপনারাও আসুন না, অনুগ্রহ করে। একটু বসে যাবেন।

এরই মধ্যে বাউণ্ডারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন জিহাদ সাহেব, আদরের ভাগ্নীকে দেখে তিনি যেনো হাতে আকাশ নাগাল গেলেন- আরে নুসাঈফা যে, কখন এলি! আয়, ভেতরে আয়।

নুসাঈফা কোনো কথা বলার আগে মামাকে সালাম জানালো। সালামের জবাব দিয়ে মামা বললেন সাথে এরা কারা।

নুসাঈফা বললো- এরা আমার একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এরা মুজাহিদ।

জিহাদ বললেন- আলহামদু লিল্লাহ। আসুন, আপনারা ভেতরে আসুন।

তাসনিম ও আবু হিশাম অগত্যা তাদের সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো।

মেহমানখানায় জড়ো হলো মামা, মামানি, মামাতো ভাই-বোন এবং তাসনিম টিমের তিনজন। তাদের আপ্যায়ন চলতে লাগলো, খাওয়া শেষ হবার আগেই মামা নুসাঈফাকে বললেন- তুই তো অনেকদিন আগে ঘর ছেড়েছিস বলে জেনেছি, দুলাভাই ফোন করেছিলেন, আমরা সবাই খুব চিন্তিত ছিলাম তোকে নিয়ে। কোথায় ছিলি এতদিন?

নুসাঈফা বললো সে অনেক কথা মামা। তবে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, আল্লাহ আমাকে ভালোই রেখেছেন।

এরপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জিহাদুল হাকিম সাহেব তাসনিম ও আবু হিশামের সমস্ত পরিচয় জানলেন এবং তাদের বাড়ি বাংলাদেশে জেনে তিনি খুশী হলেন। বললেন- বাংলাদেশ ঘোষিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র না হলেও সে দেশের ৯০% লোক মুসলমান। তবে আফসোস এইযে, সে দেশে এখনো বৃটিশ আইন বলবৎ রয়েছে, যা সত্যিই দুঃখজনক। মুসলমানরা কেনো ইয়াহুদী খৃস্টানদের তৈরি আইনে চলবে।

তাসনিম বললো- আপনি খুবই ভালো একটা বিষয় তুলেছেন মামা, কিন্তু মামা, বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হলেও, সে দেশের বেশীর ভাগ মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে অসচেতন, অজ্ঞ, তাছাড়া পার্শ্ববর্তী ভারতের আচরণ তো আপনার জানাই আছে।

এরপর মামানি মেহমানখানা ছেড়ে ভেতরে যাবার পর নুসাঈফাও নাহিন তাবার সঙ্গে পাশের রুমে চলে গেলো। ইমরানও ছুটে এলো তাদের সঙ্গে। তারা খাটের ওপর বসে গল্প করতে লাগলো।

তাসনিম আবু হিশাম ও জিহাদুল হাকিম সাহেব মুখোমুখি সোফায় বসে। জিহাদুল হাকিম বললেন- তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি।

তাসনিম বললো- আমরাও খুশী হয়েছি, আপনার মতো একজন মামাকে পেয়ে।

আবু হিশাম বললো–মামা, জেরুজালেম সম্পর্কে তো আমরা অনেক ইতিহাস পড়েছি। কিন্তু, আজ আপনার মুখ থেকে এ সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই।

মামা বললেন– অবশ্যই।

একটু থেমে থাকার পর মামা বলতে লাগলেন– ১০০খৃস্টপূর্বাব্দে দাউদ (আ.) ইয়াহুদীদের রাজ্যরূপে জুডাইর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং জেরুজালেম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ৬০৭ খৃস্টপূর্বাব্দে নেবু কাথনেজার কর্তৃক জেরুজালেম দখল ও বহু ইয়াহুদী বন্দি করা হয়। ৬৬-৬২ খৃস্টপূর্বাব্দে পাম্পেই কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হয়, তিনি সিরিয়াও বিজয় করেন। ৪৮ খৃস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজারের হাতে পাম্পেইর পরাজয় হয়। খৃস্টপূর্ব ৪অব্দে হযরত ঈসা (আ.) বা খৃস্টানদের যীশুখৃস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং আমাদের এই বেতলে হেমই তাঁর জন্মস্থান, এর পাশে রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কবর মোবারক।

তাসনিম বললো- আমরা সময় সুযোগ করে ঘুরে একটু দেখতে চাই, মামা।

মামা বললেন- অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালেই তোমাদেরকে নিয়ে বেরুবো।

এরপর একটু থেমে মামা বললেন আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তুমি তুমিই ব্যবহার করলাম, কিছু মনে কোরো না যেনো, তাসনিম বললো– কিযে বলেন মামা, বরং তুমি বলাতে আরো বেশী ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, সত্যিই আপনি আপনজন। মামা বললেন তাতো অবশ্যই, তাতো অবশ্যই। মুসলমান বলতেই একে অপরের আপনজন।

আবু হিশাম জিহাদ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইলো- আপনাদের এই বায়তুল্লাহাম বা বেতলে হেমেই কি ঈসা (আ.)-এর পূর্বপুরুষগণ বাস করতেন? জিহাদ সাহেব বললেন- না, পূর্বপুরুষ বলতে ঈসা (আ.)-এর তো পিতা ছিলো না। আল্লাহ তাআলা আদম (আ.) যেমনি মাতা পিতা ছাড়া তৈরী করেছিলেন, হাওয়া (আঃ)কে তৈরী করেছেন একইভাবে তবে হযরত আ়দমের দেহকোষ থেকে। ঈসা (আ.) কেও তেমনি পিতৃ-অংশ ছাড়া তৈরি করেছেন। তবে, আদম (আ.) মাতৃগর্ভে ধারণ না হলেও ঈসা (আ.) যার গর্ভে ধারণ করেছিলেন সেই সৌভাগ্যবতী, তার যুগের নারী কুলের শিরোমণি, পবিত্রাত্মা মহিয়সীর নাম বিবি মরিয়ম। একটু থেমে জিহাদুল হাকিম সাহেব বললেন- এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন পাকে বিস্তারিত তোমরা জেনেছো নিশ্চয়। তাসনিম বললো- তাতো জেনেছি, কিন্তু কোরআন-হাদীসে যে দেশের কথা জেনেছি, সেই দেশ, সেই মানুষ সম্পর্কে সেই দেশেরই লোকের মুখে শোনার মজাই যে আলাদা। আবু হিশাম বললো– আমরা আরো কিছু শুনতে চাই, মামা বললেন- আলহামদু লিল্লাহ। ভালো কথা শোনার ধৈর্য যাদের আছে, তাদেরকে ভালো কথা

শোনাতে অধৈর্য হবো ক্যানো। তো, বিবি মরিয়মের পিতার নাম ইমরান আর মাতার নাম হান্নাহ, তারা পৌঢ় দম্পতিতেও একটা সন্তানের মুখ দেখতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, ভাটা বয়সে তাঁরা আল্লাহর কাছে কেঁদে কেটে একটা সন্তানের জন্য আকুল ফরিয়াদ জানান এবং মানত করেন, যে সন্তান আসবে তাকে আল্লাহর ঘর মুসলমানের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের জন্য সকল সম্পর্ক মুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তাদের মনের আশা পূরণ করলেন। হান্নাহ গর্ভবতী হলেন। কিন্তু, বয়োঃবৃদ্ধ ইমরান সন্তানের মুখ দেখার আগেই ইহজগতের মায়া ছেড়ে চলে যান চিরতরে। বিধবা হান্নাহ মরিয়মকে প্রসব করার পর মহান আল্লাহর কাছে ভীত হলেন, কন্যা সন্তানকে কী করে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের উদ্দেশ্যে হাজির করবেন তিনি, যেহেতু এ কাজের স্থান কেবল পুরুষই অধিকার করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তো সবি জানেন, হান্নাহ তো জানেন না যে মরিয়মের গর্ভেই এক সুপুত্র আবির্ভূত হবে, যিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূল, নাম হবে যার ঈসা (আ.)। বিবি মরিয়ম যখন জ্ঞান বুদ্ধির বয়সে পৌঁছালেন, হান্নাহ তখন মানত পুরণ করার জন্য তাকে নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমের কাছে হাজির হলেন, মরিয়মের খালু হযরত যাকারিয়া (আ.) তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। হযরত আলী মহানবী (সা.)কে বলতে শুনেছেন, ইমরানের কন্যা বিবি মরিয়ম ছিলেন সেকালের সর্বোত্তম নারী, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিলেন হযরতের সহধর্মীনী বিবি খাদিজা (রা.)।

বিবি মরিয়মের বয়স যখন পনেরো, তখন একদিন ঘরের বাইরে একনির্জন স্থানে তিনি পূর্ণ পর্দার ভেতর একাকী গোসল সারছিলেন। আকস্মিক ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) সুদর্শন পুরুষের রূপ ধরে বিবি মরিয়মের সামনে হাজির হলেন। বিবি মরিয়ম বেগানা পুরুষ দেখে আতঙ্কিত হয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করলেন। জিব্রাঈল (আ.) তাকে অভয় দিলে বললেন– আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ আদেশের শক্তিতে তোমাকে এক মহান সন্তান দান করবেন। যিনি হবেন, বনি ইসরাইলের নবী ও রাসূল এবং বহু মোজেযার অধিকারী। বিবি মরিয়ম বিস্ময় ভরে বললেন- একি বলছেন আপনি! আমার তো বিয়েই হয়নি এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কি করে?

জিব্রাঈল (আ.) বললেন– সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এ সন্তান সৃষ্টি করবেন। এরপর ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) মরিয়মের পরিধেয় কাপড়ের উপর দিয়ে তার বক্ষদেশে সন্তানের রূহ ফুঁকে দিলেন।

কোন পুরুষের অংশ গ্রহণ ছাড়াই আল্লাহর কুদরতে বিবি মরিয়ম গর্ভবতী হবার পর তাঁর খালা খালু বিনা দ্বিধায় তাকে মেনে নিলেও অন্যান্য লোকজনেরা তাকে সন্দেহ করতে লাগলো। তারা নানা ধরণের কুৎসা রটনা করতে লাগলো।

গর্ভবতী মরিয়মের অপবাদ যখন আরো বেশী বেড়ে যেতে লাগলো তখন তিনি আর বায়তুল মোকাদ্দাসে রইলেন না। লোকালয় ছেড়ে তিনি চলে এলেন এই বেতলে হেমের নির্জন পাহাড়ী এলাকায়। নির্বাসনে দিনাতিপাত করলেও আল্লাহ পাক তার খাবারের জন্য গাছে দিয়েছিলেন পাকা খেজুর আর পাহাড়ে সুপেয় পানির ঝর্ণা। পাহাড়ী এলাকার এমনি এক খেজুর তলায় তিনি প্রসব করেন শিশু হযরত ঈসা (আ.)-কে। যিনি খৃস্টানদের যীশু আর মুসলমানদের নবী ও রাসূল ঈসা (আঃ)। খৃস্টানেরা ঈসা (আ.) কে যীশু হিসেবে মানলেও ইয়াহুদীরা তাঁকে মেনে নিতে পারলো না। ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ভেতর জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ইয়াহুদীদের হাতে খুবই নির্যাতন ভোগ করেছেন। ইয়াহুদীরা তাঁকে শুধু 'পিতৃ পরিচয়হীন' (আল্লাহ মাফ করুন) সন্তান বলেই ঘৃণা জানায়নি, তারা তদানীন্তন রোমান শাসকদের শক্তি প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টাও চালিয়েছে। জুডাস নামে তাঁর এক হাওয়ারী বা সহচর অতি সামান্য ক'টি টাকার লোভে তাঁকে ইয়াহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজদরবারে ঈসা (আ.)-এর নামে অভিযোগ উত্থাপিত হলো। তিনি দাউদ (আ.)-এর যবুর শরীফকে বাদ দিয়ে ইঞ্জিল শরীফ নামে নতুন এক কিতাবের উদ্ভব ঘটিয়ে লোকজনকে এক আল্লাহর উপাসনায় ডাকছেন। এরপর ঈসা (আ.)কে একটা ঘরের ভেতর আটকে রাখা হলো তাঁর বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য। এরই মধ্যে সেই অর্থলোভী জুডাস অতি উৎসাহী হয়ে ঈসা (আ.) কে দেখতে এলে তার নিজের চেহারা ঈসা (আঃ)-এর চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে চৌথা আসমানে তুলে নিলেন আর পরের দিনের বিচারে যীশুর আকৃতিতে শূলবিদ্ধ হলো কুচক্রী জুডাস। কাজে কাজেই খৃস্টানদের গলায় ঝুলে থাকা ক্রুশটি তথা গোটা খৃস্টানজগতের নানা ভবনে বা স্থানে ক্রুশ বিদ্ধ আকৃতিটি অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.)-এর নয়। ইয়াহুদী সেন্ট পল, যে কোন দিন ঈসা (আ.) কে দেখেওনি, সেই পলই প্রথম ঘোষণা করলো পবিত্রাত্মার কাহিনী। যে পল খৃস্ট ধর্মের অনুসারীদের দেখলে তাদের ওপর অত্যাচারে লিপ্ত হতো সেই পলই প্রতারণা করে হয়ে গেলো খৃস্টানদের প্রধান। সে-ই প্রথম ঘোষণা করলো চুরি করো, লুট করো, সন্ত্রাস করো। বলাবাহুল্য, ঈসা (আ.)-এর

খৃস্টধর্ম অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল শরীফ মিলে তৈরী হয়েছে বাইবেল, কিন্তু বাইবেলে আল্লাহ তাআলার কোন বাণীই অবিকৃত অবস্থায় নেই। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ে এতে মনগড়া পরিবর্তন পরিবর্ধন এনে এর দফা রফা করে ছেড়েছে।

জিহাদ সাহেবের কথার ভেতর আবু হিশাম বলে উঠলো– মামা, ইয়াহুদী সম্পর্কে আরো কিছু বলুন।

মামা বললেন- বলার তো আর শেষ নেই, ইয়াহুদীরা হলো এক অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন– 'তারা (ইয়াহুদীরা) আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো। আর তা এই জন্য যে তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতো এবং সীমালজ্ঘন করার জন্যই তাদের এই পরিণতি হয়েছিলো।' আরেক আয়াতে বলা হয়েছে– 'বলো যদি তোমরা মুমিন হতে তবে কেনো তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে।'

আল্লাহর এই রুষ্টতার ফলস্বরূপ ৭০ সালে রোমান সমর নায়ক টাটাউস ইয়াহুদীদের নির্বিচারে হত্যা করেন এবং যারা অবশিষ্ট ছিলো তাদের বেশীর ভাগকেই ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যান রোমে। নবী পাক (সা.) ওতো ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যিনি শপথ করেছিলেন নিশ্চয় আমি আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদী ও নাসারাদিগকে বহিস্কার করবো, এমনকি মুসলমান ব্যতীত কাউকেই এখানে রাখবো না। খৃস্টানেরাও এই ইয়াহুদীদের সহ্য করতে পারতো না। পরবর্তীতে খৃস্টানরা যখন শক্তিশালী হলো তখন তাদের হাতে ইয়াহুদীরা নির্যাতিত হতে থাকে। ইয়াহুদীরা এমনই ঘৃণার পাত্র হয়ে যায় যে, অন্যান্যদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশংকায় তাদেরকে নিকৃষ্ট পন্থাও অবলম্বন করতে হয়েছে। ইউরোপের রাজ আদেশে ইয়াহুদীরা গলায় রশি লাগিয়ে চলেছে। এরপর পশ্চিমা শাসন তাদের সাধারণ রশি খুলে কাপড়ের রশি পরিয়ে দিয়েছে। এই কাপড়ের রশিই হয়ে হলো জিউস নেকটাই। যে নেকটাইয়ের অর্থ না বুঝে কোনো কোনো অসচেতন মুসলমানও তা ব্যবহার করে থাকে।

এরপর জিহাদুল হাকিম সাহেব মৃদু কেশে নিয়ে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করেন। গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন এডলফ হিটলারও ত্রিশ লাখ ইয়াহুদী হত্যা করেছেন। ইংরেজ সাহিত্যের সম্রাট যাকে বলা হয়, সেই শেকস পীয়রও তাঁর লেখায় ইয়াহুদীদের তুখোড় বিরোধিত্য করেছেন। তাসনিম বললো– এবার মামা, ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। ফিলিস্তিন সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান প্রশ্নে সম্যক জ্ঞান চাই, মামা বললেন- এই

তো, এভাবেই এর ধারা শুরু। ৬৩৬ খৃস্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা সিরিয়া অধিকার করে নেয়। ৬৩৭ কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানরা পারস্য জয় করে নেয়। আর ৬৩৮ সালে খলিফা হযরত ওমরের খেলাফত কালে বায়তুল মোকাদ্দাস তথা জেরুজালেম জয় করে বীর মুসলমানেরা। কিন্তু ইয়াহুদী-খৃস্টানেরা এই জেরুজালেম ছাড়তে রাজী নয়। ইয়াহুদী-খৃস্টানগণও জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাসকে তাদের ইবাদতের পবিত্র স্থান হিসেবে দাবী করে। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসতো মুসলমানদেরও প্রাণ, এই বায়তুল মোকাদ্দাসই তো প্রথম কেবলা, আদম (আ.) পৃথিবীতে আসার অনেক আগে কাবাঘর সৃষ্টির ৪০ বছর পর আল্লাহর হুকুমে ফেরেস্তারা এই পবিত্র মসজিদ নির্মাণ করেন। আল্লাহর নবী রাসূলগণের অনুসারীরা এই মসজিদকে কেবলা করে ইবাদত বন্দেগী করতো, মূসা (আ.)-এর অনুসারী ইয়াহুদী, পবিত্র কোরআন পাকে যাদেরকে বনি ইসরাইল নামে অভিহিত করা হয়েছে সেই তারাও এই বায়তুল মোকাদ্দাসকে তাদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে জ্ঞান করে ইবাদত বন্দেগী করে। এরপর ঈসা (আ.) মুসা (আ.) এর তাওরাতের ইবাদত পরিবর্তন করে ইঞ্জিলের ইবাদতের আহ্বান জানালে ইয়াহুদীদের একদলতো তাঁকে মারতে চাইলো, আরেকদল যারা ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র জ্ঞান করে (নাউযুবিল্লাহ) সেই খৃস্টানেরা নতুন নিয়মে বায়তুল মোকাদ্দাসে ইবাদত শুরু করলে ইয়াহুদী-খৃস্টানদের মাঝে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর প্রিয়পাক নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর দ্বিতীয় হিজরী পর্যন্ত মোট ১৭ মাস বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে মুসলমানেরা নামায পড়ে, এরপর কাবা ঘরকে কেবলা করে নামায পড়ার জন্য আল্লাহপাক ওহি নাযিল করেন। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসকে তো মুসলমানরা ছাড়তে পারে না। হযরত দাউদ (আ.) মসজিদটিকে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। তৎপুত্র সোলায়মান (আ.) মসজিদটি সংস্কার ও বর্ধিত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা বাদশাহগণ মসজিদটির শোভাবর্ধনে ভূমিকা রাখেন তো, হযরত ওমরের আমল থেকে মসজিদটি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই ইবাদতখানা হিসেবে থাকে। তো সন্ত্রাসবাদী খৃস্টানেরা ততোদিনে ফুসে উঠছিলো। পোপের নির্দেশে যে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) হয়ে ছিলো তার এক পর্যায়ে ১৫ জুলাই ১০৯৯সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেমে প্রবেশ করে নির্বিচারে নিরীহ মুসলমান ও ইয়াহুদীদের হত্যা করে। শহর ভরে যায় লাশের স্তুপে। রক্তের বন্যায় বায়তুল মোকাদ্দাসে

আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষের হাটু ডুবে যায়। ৭০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এ মসজিদে। খৃস্টানেরা তখন জেরুজালেম আর ফিলিস্তিন অধিকার করে নেয়। এরপর আসেন ইসলামের মহাবীর গাজী সালাউদ্দিন আইয়ূবী (রহ.)। তিনি পাশ্চাত্য, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্সসহ মোট ১১টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। তবে তিনি জেরুজালেমে বন্দি খৃস্টানদের ওপর কোনরূপ নির্যাতন করেননি, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেয়া হয়, গাজী সালাউদ্দিন শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে খৃস্টান শাসকদের লাগানো ঘণ্টা এবং এই মসজিদের যে পাথরে দাঁড়িয়ে রাসূল পাক (সা.) মেরাজের ভ্রমণ শুরু করেন সেই 'কুব্বাত আস সাখ্‌রা' খৃস্টানরা যাকে 'ডোম অব দি রক' নামে অভিহিত করে তা থেকে খৃস্টানদের লাগানো সোনার ক্রুশ সরিয়ে দেন।

খৃস্টানরা পরাজিত হয়ে জেরুজালেম ছেড়ে দিলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে দূরভিসন্ধি লেগেই থাকে। তারা প্রকাশ্যে দূরে দূরে থাকলেও ইয়াহুদীদের দিয়ে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন দখল করায়। উনবিংশ শতাব্দীর জেরুজালেম তথা ফিলিস্তিন ট্রাজেডীর জন্য বৃটিশরাই বেশী দায়ী। ১৯৪৭ সালে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়াসহ ৩৩টি দেশ জাতিসংঘে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, ইয়াহুদীদেরও একটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে। '৪৭-এর ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে একটি বানায় ইয়াহুদী রাষ্ট্র যার আয়তন ১৪.১০০বর্গ কিলোমিটার এবং অন্যটি আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন যার আয়তন ১১,১০০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৪৮ সালের ২৪মে তেলআবিবকে রাজধানী করে ইয়াহুদীরা স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। ১৯৪৯ সালে ইসরাইল জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ফিলিস্তিন আজো স্বাধীনতা পায় নি। বরং সে জাতি কেবলি নির্যাতিত হয়েই চলছে। ১৯৬৯ সালে আগস্ট মাসে ইসরাইলের ইয়াহুদী চক্র বায়তুল মোকাদ্দাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পবিত্র মসজিদের অনেক ক্ষতি সাধন করে এরপর ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে ইসরাইল সরকার এ মসজিদকে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে এ মসজিদে নামায আদায়রত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তারা নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এ হত্যা যজ্ঞ আজোবধি তারা বহাল রেখেছে। যখন তখন বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে তারা নিরীহ ফিলিস্তিনীদের হত্যা করছে, লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী আজ দেশ ছাড়া, উদ্বাস্তু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় নিয়ে চরম মানবেতর জীবন যাপন করছে তারা। ফুটপাতে, ড্রেনের ধারে, নোংরা পরিবেশের মাঝে মুসলিম

মায়েরা সন্তান প্রসব করছেন, সেইসব সন্তানেরা বড়ো হয়ে আজ নিজের ঘর-বাড়ি, জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার কারণ বুঝতে শিখেছে। প্রতিটি ফিলিস্তিনী জনগণ ইসরাইল, আমেরিকা, ইউরোপকে ঘৃণা করতে শিখেছে। শেষের কথাটা বলতে বলতে মামা কেমন উদাস হয়ে গেলেন, তাসনিম আক্ষেপ ঝেড়ে বললো- আফসোস! এমন একটা পবিত্র দেশকে নিয়ে অভিশপ্ত ইহুদীরা এমন নোংরা খেলায় মেতে আছে, অথচ বিশ্ব মুসলমানরা এখনো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তারা আর কবে বুঝবে যে, জেরুজালেম কিংবা বায়তুল মোকাদ্দাস কেবল ফিলিস্তিনী জনগণেরই নয়, এ পবিত্র শহর ও মসজিদ সমগ্র মুসলিম জাতির।

আবু হিশাম সোফার ওপর আধশোয়া হয়ে জিহাদুল হাকিম সাহেবে দিকে চেয়ে বললো- আচ্ছা মামা, ইয়াহুদীরা যে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করলো, এর পেছনে তাদের দাবীর ভিত্তি কি?

মামা বললেন- ওই যে বললাম, তাদের শ্লোগান ছিলো, ইয়াহুদীদেরও একটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে, তাছাড়া তাদের মূল দাবী হলো, বাইবেলে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে ফোরাত থেকে নীল নদী পর্যন্ত এলাকা তার বংশধরদের দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই যদি হয় তাহলে ইব্রাহীম (আ.)-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) উভয়ের বংশধরদের জন্যই এ অধিকার বর্তায়। তাছাড়া তারা কোরআন পাকে বনী ইসরাইল নামে যে জাতিকে অভিহিত করা হয়েছে, সেই জাতি হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করে। কালের প্রত্যাবর্তনে তারা কেউ গিয়েছিলো বৃটেনে, কেউ জার্মানীতে, কেউ রোমে, কেউ ফ্রান্সে, কেউ পোলান্ডে, কেউ আমেরিকায়। এই তারাই হয়েছে ইসরাইলের জনগণ। কিন্তু ইয়াহুদী ধর্ম উদ্ভবের হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে ফিলিস্তিন একটি জনঅধ্যুষিত ভূখণ্ড ছিলো। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানে বসবাস করেছে ফিলিস্তিনী ইয়াহুদী ও কেনআনী জনগণ। আর কালের আবর্তে ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর ইসহাক (আ.)-এর বংশধর, কেনআনী, ফিলিস্তিনী সব একীভুত হয়ে হয়েছে অভিন্ন আরব জনগণ, যারা গিয়েছিলো তারা তো বংশ পরিচয় ছেড়েই গিয়েছিলো। এতকাল পরে ফিরে এসে তারা একটা দেশের ওপরতো এভাবে নিষ্পেষণ চালাতে পারে না। তারাতো ভেবেছে আরেকটা ফারুকে আজম জন্ম নিবেন না, আরেকটা সালাউদ্দিন আইয়ূবী জন্ম নিবেন না। তখনি তাসনিম বলে উঠলো- অবশ্যই জন্ম নিবেন। ইনশাআল্লাহ, এই আমরা অনেক কিছু করে ফেলবো। এরমধ্যে গৃহ

পরিচারক যুবায়ের এসে মোবাইল ফোনটা জিহাদুল হাকিম সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন- কে করেছে, নাম বলেননি, আপনাকে চাচ্ছেন।

-ঠিক আছে, দাও। বলে হাকিম সাহেব মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে কানে লাগালেন। যুবায়ের চলে গেলো পাশের রুমে। বন্ধু মাহবুব আরেফীনের সঙ্গে কথা সেরে হাকিম সাহেব মোবাইল ফোনটা টি টেবিলে রাখতেই তাসনিম বিনয়ী স্বরে বললো- মামা অনুমতি পেলে একটা ফোন করতে চাই।

মামা বললেন- অবশ্যই, কেন নয়।

সেটটা তিনি তাসনিমের হাতে তুলে দিলেন, তাসনিম ওস্তাদ খালিদ বিন আতাউল্লাহর নাম্বারের বাটনগুলো টিপে দিলো। সালাম জানিয়ে বললো- ওস্তাদ, আমি তাসনিম।

ওস্তাদের কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ঝরে পড়লো- তাসনিম! আমি তোমাদের চিন্তায় বড় অস্থির ছিলাম। শতোরকম চেষ্টা করেও তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগে সফলকাম হইনি বা কোন হদিস পাইনি, তোমরা ক্যামন আছো, কোথায় আছো? তাসনিম বললো- ওস্তাদ, আফগানিস্তানে আমরা সাথীদেরকে হারাবার পর আল্লাহর রহমতে তিনজন মাত্র প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি, আর আমরা এখন ফিলিস্তিনে অবস্থান করছি।

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- আলহামদু লিল্লাহ, এমন একটা দেশে তোমরা গিয়েছো জেনে আমি সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। ওখানকার মাটি বড়ো পবিত্র। কিন্তু ওই মাটিতে বহুকাল ধরে মুসলিম পীড়ন চলে আসছে। আজো সেখানে হিংস্র ইহুদীরা মুসলমানের রক্তে হোলি খেলায় মত্ত। আল্লাহ তোমাদেরকে ঠিক সময় ঠিক জায়গাটিতেই নিয়েছেন। এই সন্ত্রাস তোমাদেরকেই রুখতে হবে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। জেরুজালেমেও আমাদের টিম রয়েছে। সেখানকার দলপতি আল মোবাশ্বেরের সঙ্গে আজো আমার কথা হয়েছে। তুমি তোমার ঠিকানা দাও, মোবাশ্বের তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

তাসনিম বললো- ঠিকানা সহজ ওস্তাদ, জেরুজালেম ও বেতলেহেমের মধ্যবর্তী জায়গা রাওদা। এই রাওদারই আমীর জিহাদুল হাকিম সাহেবের বাড়িতে আমাদের অবস্থান। খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- ওকে, ধন্যবাদ। আর শোনো তাসনিম, তুমিই এখন জেরুজালেমের দলপতি। অতএব, সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ঠিক ভাবে কাজ চালিয়ে যেও। আমি আরো কিছু লোক অচিরেই পাঠাচ্ছি। কিছু যুদ্ধপোরকরণও থাকবে তাদের সঙ্গে। আমি চাই

আগামী শুক্রবার বায়তুল মোকাদ্দাসে তোমরা জুমার নামায আদায় করো। আর তোমরা ভেবোনা, সুখবর জেনে রাখো এই যে, এদিকে আমাদের কাজও খুব ভালো চলছে, আমরা গোটা পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। ইতোমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও বেশ কতোগুলো দেশের সীমান্ত খুলে দেয়া হয়েছে। এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশে একই মুদ্রা চালু হতে যাচ্ছে।

তাসনিম বললো– আলহামদু লিল্লাহ। এটা সত্যিই বড়ো সুখবর ওস্তাদ। এইতো আমাদের প্রাণের দাবী, সমগ্র বিশ্বের মুসলমান একবার এক হয়ে মিলে যাক, দেখবে কি হয়!

খালিদ বিন আতাউল্লাহ বললেন- ইনশাআল্লাহ, মুসলিম বিশ্ব আজ সত্যিই যেভাবে জেহাদী জজবায় জাগরিত হয়ে উঠছে, তাতে করে আর অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের এই আকুল আকাংখার বাস্তবায়ন ঘটবে বলে মনে হয়।

তাসনিম বললো, তো ওস্তাদ, আজ এ পর্যন্তই, ইনশাআল্লাহ আবার কথা হবে, নাম্বারটা সেভ করে রাখুন।

এরিমধ্যে মসজিদ থেকে ভেসে এলো ফজরের আযান। মামা বললেন- হায় আল্লাহ! রাত ফুরিয়ে গেলো, অথচ তোমাদেরকে একটু বিশ্রাম নিতেও দিলামনা।

তাসনিম বললো কি যে বলেন, মামা! আমরাতো আল্লাহর সৈনিক, কতোরাত, কতোদিন না ঘুমিয়ে কতো সময় কতোভাবে কেটে যাবে আমাদের, এটাইতো স্বাভাবিক, আর আমরাতো পৃথিবীতে আরাম করতে আসিনি। তাছাড়া জ্ঞান আহরণ করা তো ইবাদত। আর যা-ই হোক আমরাতো আজ আপনার কাছ থেকে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছি।

মামা বললেন- সবি আল্লাহর ইচ্ছা।

এরপর তারা অজু সেরে জামাতে নামায আদায় করলো। সামান্য বিশ্রাম শেষ করে তারা বাউন্ডারীর ভেতরে বাগানের কাছে ইতস্ততঃ হাটাহাটি করতে লাগলো। এরই মধ্যে গেটের কলিং বেলটা বেজে উঠলো। জিহাদ সাহেব এগিয়ে এসে গেট খুলে দিতেই মোবাশ্বের তাঁকে সালাম জানিয়ে তার কাছে তাসনিমকে পেতে চাইলো।

সালামের জবাব দিয়ে জিহাদ সাহেব মোবাশ্বেরকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে আগন্তুক মোবাশ্বের তাসনিম ও আবু হিশামকে নিয়ে যেতে চাইলো। মামা তাতে বাঁধা দিয়ে বললেন- আপাতত আমার এখানেই

থাকতে পারবে ওরা, থাকার কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া আমরা সবাই যখন আল্লাহর সৈনিক, তখনতো আমাদের কাছে এসব কোন ব্যাপারই নয়।

মামা মোবাশ্বেরকে বললেন- আপনার জরুরী কথাবার্তা ভেতরে বসে সারতে পারেন, কোন অসুবিধে নেই। আসুন, ভেতরে আসুন।

তারা সবাই মেহমান খানায় এসে বসলো, এরিমধ্যে টেবিলে নাশতা চলে এলো। তারা খেয়ে দেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলো। মোবাশ্বের জানালো- আমরা এখানে ইসলামিক জিহাদ মিশনের ১০০জন সদস্য রয়েছি, স্থানীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো মিশনে কাজ করেছি। আমাদের মিশন এখনো চলছে। আগামী পরশু শুক্রবার জুমার নামায আমরা মুসলমানরা পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাসে আদায় করতে চাই। বায়তুল মোকাদ্দাসকে আবার মুসলমানের করায়ত্তে নিয়ে আসতে হবে।

তাসনিম বললো- অবশ্যই।

মামা বললেন- আমিও এতে একমত, আল্লাহ যেনো আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন।

শুক্রবার ভোর থেকেই বায়তুল মোকাদ্দাসকে ঘিরে রেখেছে ইসলামিক জিহাদ ও সহযোগী বাহিনীর কর্মীরা। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সে খবর পেয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। দ্ব্যর্থহীণ কণ্ঠে সে ঘোষণা করে দিলো ফিলিস্তিনসহ পুরো জেরুজালেমকে আমি লালেলাল করে দেবো আরব মুসলমানদের রক্তে। তবে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। তোমরা তৈরী হয়ে যাও। এখনি ট্যাংক, গোলাবারুদ, বোমা, কপ্টার নিয়ে চলে যাও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহরে। বুল ডোজার নিয়ে যাও, ঘরবাড়ি ধ্বংস করো তবে আল আকসায় অবস্থানরতদের ওপরে এখনি হামলা চালিও না, ওরা যখন সবাই নামাযে সিজদায় পড়বে, সেই সুযোগেই ওদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে

বায়তুল মোকাদ্দাসের জুমআর নামাযে তিন সহস্রাধিক মজলুম অংশগ্রহণ করেছে। আর এই নামাযের ইমামতি করছেন শায়খ আবদুল্লাহ আল-ফাত্তাহ। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদায় মাথা লুটিয়ে নামাযিরা যখন আল্লাহর সমীপে আনত, ঠিক তখনি তাদের ওপর চড়াও হলো ইসরাইলী বাহিনী। বোমার পর বোমা, গ্রেনেডের পর গ্রেনেড, সেল, মিসাইল চলতে লাগলো নির্বিচারে। তাসনিম আবু হিশামকে নিয়ে সরে যেতে পারলেও জিহাদুল হাকিম সাহেব আর পারলেন না, কতোগুলো গুলি তার মাথা পিঠ ঝাঝরা করে দিয়েছে। মোবাশ্বেরের

গায়েও লেগেছে তিনচারটা গুলি। তবে সে প্রাণ হারায়নি, সহকারীদের সহযোগিতায় নিজস্ব আস্তানায় পৌঁছে গেলো সে। তাসনিম ও আবু হিশাম তাদের কাউকে খুঁজে না পেয়ে ধীরে ধীরে তারা রাওদার পথ ধরলো।

এদিকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহরেও ইসরাইলী বাহিনী অকথ্য ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কিশোর ইমরান দৌড়ে এসে মাকে খবর দিলো- মা, বুলডোজার আসছে! আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে। অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলেছে। মেরেও ফেলেছে অনেককে। আমাদেরকেও হয়তো মেরে ফেলবে আম্মু, চলো আমরা পালিয়ে যাই।

মা বললেন- নারে বাছা! কোথায় পালাবো আমরা নাহিন তাবা মায়ের কথার রেশ ধরে বললো- তাইতো আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না। নুসাঈফাও তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করলো। এরিমধ্যে কতোগুলো সশস্ত্র ইসরাইলী দানব ঝটপট ঢুকে পড়লো তাদের রুমে। দু'জন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েকে দেখে তারা হায়েনার হাসি হেসে উঠলো। তারপর চিলের মতো ছোঁ মেরে নুসাঈফা ও নাহিন তাবাকে বাইরে টেনে নিলো।

নাহিন তাবার মা আমাতুল্লাহ তাদের পেছন পেছন ছুটে এসে বিলাপ করতে লাগলেন- এদেরকে তোমরা নিওনা, আল্লাহর কসম লাগে ওদেরকে তোমরা ছেড়ে দাও।

ইমরান মায়ের সাথে সাথে ছুটে এসে বললো- আপুদেরকে রেখে যাও, নিয়ে যেওনা আমার আপুদেরকে...

তখনি তাগড়া দেহের এক সৈন্য পেছন ফিরে মেশিন গান তাক করলো ইমরানের দিকে, ভয়ে পিলে চমকে গেলো ইমরানের। মুরগীর বাচ্চার মতো দৌড়ে সে মায়ের কোলের ভেতর ঢুকে পড়লো, মা একটা হাত তুলে বললেন- গুলি কোরো না, প্লিজ গুলি করো না। কিন্তু, পাষণ্ড নরপশুর বুকে মায়ের এই আকুল আকুতি এতটুকু করুণার সৃষ্টি করতে পারল না। ঠাশ্! ঠাশ্! করে উপর্যুপরি গুলি চালিয়ে দিলো কিশোর ইমরানের বুকের উপর। মা তার সন্তানের জন্য কিছুই করতে পারলেন না। শয়তানেরা মায়ের বুকেও চালিয়ে দিলো একাধিক গুলি। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত আর্তচিৎকারে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লো মা ও ছেলে।

তা দেখে নুসাঈফা ও নাহিন তাবা চিৎকার ছেড়ে লাশের কাছে ছুটে আসতে চাইলো। কিন্তু, শত্রুরা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলো গাড়ীতে করে।

গাড়ী ছেড়ে দেবার আগে শয়তানেরা বুলডোজার চালককে ইঙ্গিত দিলো হাকিম সাহেবের বাড়ীটা ভেঙ্গে দেবার জন্য। তারা গাড়ী ছেড়ে দিলো, বুলডোজার বাড়ী ভাঙ্গতে শুরু করলো।

তাসনিম ও আবু হিশাম যখন ফিরে এলো, তখন দেখলো, সেই সুন্দর মনোরম বাড়ীটা ধূলির সাথে মিশে গেছে। তাসনিম ও আবু হিশাম বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো- এখানে তো কেবল মামানি আর ইমরানের ক্ষত বিক্ষত লাশ পড়ে আছে, নুসাঈফা গেলো কোথায়! নাহিন তাবাইবা কোথায় আছে! কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের।

আবু হিশামের মুখের দিকে চেয়ে তাসনিম বললো- নুসাঈফা তো বলেছিলেন, আমাদেরকে ছেড়ে কোথাও কখনো যাবেন না, নিশ্চয় তিনি শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছেন। নইলে যাবেন কোথায়।

আবু হিশাম বললো- যে করে হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে, ভাইয়া। তাকে তো আমরা এভাবে হারাতে পারি না। একটু থেমে আবু হিশাম আবার বললো- কিন্তু তাকে কোথায় খুঁজবো। আর কিভাবেই বা পাবো তাকে।

তাসনিম বললো- আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আবু হিশাম বললো- আমরা যে এরোড্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে একবার গিয়ে দেখা যাক, হয়তো পেয়েও যেতে পারি তাদের।

তাসনিম বললো- মন্দ বলোনি। চলো তবে, যাওয়া যাক সেদিকে।

আল্লাহ নামে তারা পথ ধরলো সন্তর্পনে।

কিন্তু, নাহ! ওখানে ফিরে এসে নুসাঈফার কোনো হদিস পেলো না তারা, জায়গাটি এখনো সেই আগের মতো, নির্জন পড়ে আছে।

এদিকে ইসরাইলীদের হিংস্রতা আরো বেড়ে গেলো। তারা ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর দখল করতে লাগলো, শহরবাসীদের হত্যা করতে লাগলো, বিতাড়িত করতে লাগলো, ভারি মেশিনগান, ট্যাংকের গোলাগুলি আর বিমান হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রে জনপদ ধ্বংস করতে লাগলো।

কোথাও কোনো সাংবাদিককে যেতে দেয়া হচ্ছে না, যেনো সঠিক তথ্য তারা সংগ্রহ করতে না পারেন, বিশ্বকে জানাতে না পারেন। বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে কার্ফিউ বলবৎ রেখেছে। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের বাসভবন ঘেরাও করে তাঁকে ধরে আনতে চাইছে শয়তানেরা।

এসব খবর জেনে তাসনিম ভাবলো, ফিলিস্তিনের অবস্থাও তো আজ আবার আফগানিস্তানের মতো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, একটা কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না রাখতে পারলে, আমরা তবে কিসের জিহাদকারী, কিসের মুজাহিদ, তারা দু'জন আল মোবাশ্বেরের গোপন ঠিকানায় ফিরে এলো।

আল মোবাশ্বের মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার দেহে অস্ত্রোপাচার করে বিদ্ধ হওয়া গুলি তিনটা অপসরণ করা হয়েছে।

এই গোপন আস্তানায় ইসলামী জিহাদ ও এর সহযোগী সংগঠনের তিন শতাধিক টগবগে মুজাহিদ মিলে তারা নানান শলাপরামর্শ করতে লাগলো কি করে ইসরাইলীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া যায়, এক পর্যায়ে তারা অনেকে আত্মঘাতী হামলায় বিশ্বাসী হয়ে কোমরে, বুকে, পেটে, শক্তিশালী বোমা বেঁধে ইসরাইলী জটলার মাঝে গিয়ে সে বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগলো, এভাবে একজন মুজাহিদের শাহাদাতের বিনিময়ে ১০০, ৫০০ থেকে হাজার পর্যন্ত ইসরাইলী শয়তান মরতে লাগলো।

এভাবে আরো কিছুদিন কেটে যাবার পর ইসরাইলীরা মোটে না দমে বরং তারা আরো ভয়ঙ্কর পাশবিক রূপ নিলো, পুরো ফিলিস্তিন জুড়ে তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার কথা ঘোষণা দিলো। এরপর পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলে ওরা পবিত্র নগরী জেরুজালেমে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করলো এবং দিন তারিখও ধার্য হয়ে গেলো, ২১ তারিখ আশিটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির আওতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

খবর শুনে তাসনিম আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। মোবাশ্বেরের মোবাইল ফোন নিয়ে খালিদ বিন আতাউল্লাহকে কল করে জানালো- সবতো শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওস্তাদ। আমরা তো আর কিছুই করতে পারছি না; বড়ই দুঃসংবাদ এই যে, এই পবিত্র রমযানে সোমবার পবিত্র নগরী জেরুজালেমে শয়তানেরা বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ১০৫টি দেশ থেকে প্রতিযোগিনীরা ইতোমধ্যে আসতেও শুরু করেছে। এমন কথা শুনতেই খালিদ বিন আতাউল্লাহ ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়লেন– নাহ! আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে ওই পবিত্র ভূমিকে আর কলুষিত করতে দেবো না। অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য করবো না। তুমি দুর্বল হয়ো না, আমি নিজেই চলে আসছি জেরুজালেমের মাটিতে, শত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করবো, আর ভয় নেই

ইনশাআল্লাহ, সমস্ত বিশ্বের তুখোড় মুজাহিদরা আসবে এই বেঈমানদের শায়েস্তা করতে। আর আমি জেরুজালেম আসার আগেই সেই ব্যবস্থা করে আসছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, আল্লাহ হাফেয। বলে খালেদ বিন আতাউল্লাহ ওয়ারলেস অফ করে বুশের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখলেন–

মিঃ বুশ,

পৃথিবীতে আপনারা মানুষ নামে জন্ম নিয়েছেন সত্য। কিন্তু, আপনাদের মানও নেই আর হুশও নেই। অনেক জ্বালিয়েছেন, অনেক পুড়িয়েছেন। লাখো লাখো মানুষকে হত্যা করে গড়েছেন তথাকথিত সভ্যতা, সত্যের মুখোশ পরে ফলিয়ে যাচ্ছেন মিথ্যের ফসল। রাতের অন্ধকারে থেকে মিছেমিছি গেয়ে যাচ্ছেন সূর্যসংগীত। ভালোবাসার মাঝে রেখেছেন হিংসার বিষাক্ত কীট। আপন স্বার্থপরতার পদমূলে দলে চলেছেন মানবতা। বুকে মেরে মুখে প্রেম শিখাচ্ছেন আপনারা, এই আপনারাই সূচনা করেছেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অথচ দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন মুসলমানের ঘাড়ে। মুসলমানরা তো সন্ত্রাস করতে জানে না, মুসলমানরা তো সন্ত্রাস করতে চায় না, মুসলমানরা নামায পড়ে আল্লাহকে পেতে চায়। আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে চায়। আর যখনি তারা বাধাগ্রস্থ হয় তখনি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখনি তারা জিহাদ ঘোষণা করে। তখনি তারা আল্লাহর নামে শহীদ হয়ে যায়। আজ আপনি আফগানিস্তান ধ্বংস করে দিলেন। আবার ইসরাইলকে দিয়ে আগ্রাসন চালাচ্ছেন ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানের ওপর। অনেক জ্বালিয়েছেন, এবার আপনাদের জ্বলবার পালা, অনেক পুড়িয়েছেন এবার আপনাদের পুড়বার পালা, মনে রাখবেন, মুসলমানরা হেরে যাবার জাতি নয়। তারা আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। আজ আর ক্ষমা নেই, আপনাদের ধ্বংস আমাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে। অতএব, সময় শেষ হবার আগে একবার মুসলমানের অর্থ জেনে নিন, একবার ইসলামের গুরুত্ব ও আদর্শ বুঝে নিন। একবার শুধু একবার হলেও পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর বাণী পাঠ করে নিন। আমি আপনার কাছে ইংরেজীতে অনুবাদসহ কোরআন শরীফ ও হাদীস সংকলন প্রেরণ করলাম।

আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

ইতি

খালিদ বিন আতাউল্লাহ।

চিঠিটি ই-মেলে বুশের নামে প্রেরণ করার পর কম্পিউটার সিস্টেমে কোরআন ও হাদীস শরীফও পাঠিয়ে দেয়া হলো বুশের ওয়েব সাইটে।

এরপর খালিদ বিন আতাউল্লাহ সমগ্র বিশ্বের ইসলামিক জিহাদ মিশনের নেতাদেরকে আশেপাশের সমস্ত মুসলিম দেশের খোলা সীমান্ত দিয়ে ইসরাইলের দিকে সদলবলে ধাবিত হবার জন্য জরুরী আহ্বান জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে কথা মতো কাজ শুরু হয়ে গেলো।

যার যতটুকু সামর্থ আছে, তাই নিয়ে আজ ছুটেছে মুসলমানের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের মর্যাদা রক্ষার্থে। তথা সমগ্র বিশ্ব থেকে মুসলমানের ওপর জুলুম অত্যাচারের নিষ্পেষণ বন্ধ করার প্রত্যয়ে। তাদের মুখে কেবল একই শ্লোগান নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার আজ বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই মহাবাণী সমগ্র পৃথিবীর আকাশে বাতাসে সত্যিকারার্থে ধ্বনিত হচ্ছে–

> "বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
> শির উঁচু করি মুসলমান
> দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার
> ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান।"

এদিকে সোমবার সকাল থেকেই জেরুজালেম শহর ১০০টি দেশের তরুণীদের পদভারে লজ্জিত হয়ে উঠেছে। এই পবিত্র মাহে রমযান মাসে মেয়েদের নিয়ে এই বেলেল্লাপনা থেকে ইসরাইলী পুরুষগুলো কিছুতেই বিরত থাকতে চাইলো না।

তথাকথিত প্রগতিশীলরা যেহেতু নারীর সম্মান প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন সেহেতু নারীদেরকে নিয়ে তারা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো নোংরা খেলায় মেতে উঠতে পারে। কিন্তু, আফসোস তথাকথিত মুসলমান মেয়েরাও আজ কেউ কেউ পৃথিবীর মোহে অন্ধ হয়ে এইসব জাহেলিদের হাতের পুতুল হয়েছে। তারা স্বীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিসর্জন দিয়ে ইয়াহুদী খৃস্টান চরিত্রহীনদের দোসর হয়ে নিজের সেই নোংরামীতে আরো বেশী নোংরা করে তুলছে সমাজ, জাতি, দেশ পৃথিবী। তাসনিম জানে, একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীদেরকে প্রকৃত মর্যাদা দান করেছে। অন্যসব ধর্মমতেই নারী হলো অভিশপ্ত। ইয়াহুদীরা বলে থাকে- নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে সম্ভোগ সুখ দেয়া। নারী পাপের প্রস্রবণ, কোনো

পূণ্য কাজ করার কোনো যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে কোনো নারী সম্মানের যোগ্য হতে পারে না। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস এই যে একমাত্র হাওয়া বিবির কারণেই, বা তার ফুসলানিতেই হযরত আদম (আ.) গন্ধম আস্বাদন করেছিলেন। কোনো কোনো ইয়াহুদী এই গন্ধম আস্বাদনটাকে নারী পুরুষের দেহ মিলনকেই বুঝিয়ে থাকে এবং তারা বলে থাকে, সেই হাওয়ার কারণেই হযরত আদম (আ.) দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবনকে বিপদাপন্ন করেছেন। তাই ইয়াহুদীরা গোটা নারী জাতিকে অন্যায় ও পাপের উস্কানীদাত্রী হিসেবে জ্ঞান করে থাকে। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই শুধু ভোগেরই পাত্র তারা। আর খৃস্টধর্মেও নারীদেরকে পাপের পথিক বলা হয়, তারা মনে করে, মা হাওয়ার ভুলের কারণে নারীর রক্তে স্থায়ী পাপ স্থান করে নিয়েছিলো। আর মানব শরীরে মায়ের রক্তের অংশ থাকে বলেই সন্তানও জন্মগতভাবে পাপী হয়েই জন্ম নেয়। তারা বলে থাকে এই পাপ ও পাপসৃষ্টি বহুদিন ধরেই চলে আসছিলো। তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমণের প্রয়োজন ছিলো, যিনি নিজ রক্তদানে মানবকুলের তথা মানব আঁচলের পাপদাগ ধুয়ে মুছে দিতে পারেন। খৃস্টানেরা বলে থাকে- যীশুখৃস্ট (হযরত ঈসা আ.)-ই ওই মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি শূলবরণ করে আত্মকোরবানী দ্বারা মানুষের এই পাপ কলঙ্ক মিটিয়ে ছিলেন। মা হাওয়া (আ.) কৃত পাপের কলঙ্ক ঘুচাবার এছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। (নাউযুবিল্লাহ)। তাই তারা নারীদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে ।

সুন্দরী প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা একটা স্মারক প্রকাশ করেছে। তার একজায়গায় লিপিবদ্ধ হয়েছে- "সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিশ্চয় একটি প্রশংসনীয় কাজ। এ কাজের মাধ্যমে নারীদেরকে সম্মান করা হয়, বৈষম্য দূর করা হয়। তাই সব ধর্মের অনুসারীদেরকেই এই প্রতিযোগিতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করা উচিত। আজ মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) বেঁচে থাকলে কি করতেন, নিশ্চয় তিনি এই প্রতিযোগিতা দেখে খুশী হতেন এবং এতশত সুন্দরী নারীর ভেতর থেকে সবচে বেশী সুন্দরীদেরকে শুভেচ্ছা জানাতেন।"

এমন কথা পড়েই তাসনিমের পুরো শরীরের রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো। প্রিয় নবী পাকের (সা.) পূতঃপবিত্র অনুপম ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এমন বিদ্রুপ করার দুঃসাহস যারা দেখায়, তাদের আর রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ খালিদ বিন আতাউল্লাহ জরুরি পরামর্শে বসলেন। অতপর উপদেষ্টাবর্গের সাথে আলোচনা শেষে খালিদ বিন আতাউল্লাহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ারলেসে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন, মুনীর ও তার আত্মঘাতি টিম যেন পবিত্র নগরীর বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা বোমা হামলায়

উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। শক্তিশালী হামলায় ১৮ তলা জিউক ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের হলরুম অন্ততঃ হাজার খানেক লোকসহ ধূলায় পরিণত করতে হবে। মুনীর জি আচ্ছা ভাইয়া, বলে প্রস্তুতিতে লেগে গেল।

প্ল্যান অনুযায়ী বোমা বহনের জন্য ঠিক করা হলো বসনিয়ান সুন্দরী ফারহা মিলদভিচকে বহনকারী গাড়িকে। যদি এটা মিস হয় তাহলে জিউশ হোটেলের সিকিউরিটি বিভাগে কর্মরত প্যালেষ্টাইনী আরব গুপ্তচররা যে কোন ভাবে বোমা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। খালিদ বিন আতাউল্লাহ সময় বেঁধে দিয়েছেন। এশার জামাত শেষ হওয়ার পরপরই তিনি ইয়াহুদীদের আনন্দধ্বনির স্থলে কান্নার রোল তুলতে চান। হামলার দায়িত্ব স্বীকারের জন্য ইসলামিক জিহাদ ফ্যাক্সবার্তা রেডি করে রেখেছে।

মাগরিবের নামাজ শেষে খালিদ বিন আতাউল্লাহ দুশমনের চোখে ধুলা দেয়ার জন্য ইসরাঈলী একটি সাঁজোয়া বহরে চড়ে জেরুজালেম ত্যাগ করলেন। তার পরনেও ছিল ইসরাঈলী সামরিক কর্মকর্তার পোষাক। এদিকে তাসনিম টিমকে কাংখিত গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে একটি ডামি হেলিকপ্টার। ইসরাঈলী সামরিক বাহিনীকে ধোকায় ফেলে রেখে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের শীর্ষ পর্যায়ের মুজাহিদরা আজ তুরে সীনা বা সিনাই পর্বতের এক ঐতিহাসিক ঘাঁটিতে চূড়ান্ত বায়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানে সমবেত হচ্ছেন।

প্রায় দেড়'শ কিলোমিটার কংকরময় মরুপথ পাড়ি দিয়ে খালিদ বিন আতাউল্লাহ পৌঁছে গেলেন পার্বত্য ঘাঁটিতে। হেলিপ্যাডে অপেক্ষারত স্পেশাল গার্ডরা তাসনিম টিমকে ইতোমধ্যেই পৌঁছে দিয়েছে যথাস্থানে। সব মিলিয়ে শ' তিনেক লোক হবে এ হলরুমে। জামাতে মাগরিব পড়লেন তারা সবাই। দেখেই বুঝা যায় পৃথিবীর নানাদেশের পোড় খাওয়া এ মর্দে মুজাহিদদের দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসায় পাগলপারা। মুসলিম উম্মাহর হৃতমর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠায় এরা নিবেদিতপ্রাণ নেতা। বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদী-নাসারা ও নাস্তিক্যবাদী নেতৃত্ব খতম করে ইসলামের নেতৃত্ব স্থাপনই এদের জীবনের মূল লক্ষ্য। আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে এরা বদ্ধপরিকর। তাসনিমের চোখে পানি এসে গেলো, এসব সিংহহৃদয় মুজাহিদদের দেখে। আখেরী যামানায় এরাই তো সাহাবায়ে কেরামের নমুনা। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৈনিক এরা। এরাই আল্লাহর রাহের মুজাহিদ। পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসী কাফের মুশরিক তথা ইসলামের দুশমনচক্র এ নেতৃত্বের ভয়ে আজ ভীত-সন্ত্রস্ত।

এরি মধ্যে একজন ঘোষক অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভাই ও বন্ধুগণ! পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত হচ্ছে। মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন মিসরীয় প্রতিনিধি। আল্লাহর কালাম শুনে প্রতিটি শ্রোতার চোখের পানি টলমল করছে। বিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করছেন অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত মুজাহিদ নেতৃবর্গ। বাংলাদেশ, ভারত ও আফগান প্রতিনিধিদের দাড়ি ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। আল্লাহর অপার করুণা ও তাঁর কৃত বিজয়ের অঙ্গীকারগুলো এ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে বলেই কি এত কান্না! মহাদেশ পর্যায়ের ৪/৫ জন প্রতিনিধির অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর মেহমানদের পাশ্ববর্তী একটি গুহার ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানেই তারা বায়আত আলাল জিহাদ করবেন যুগের ওলী হযরত মুজাহিদে আজমের হাতে।

মেহমানরা যখন একে একে কক্ষটিতে প্রবেশ করছিলেন মুজাহিদে আজম তখন আওয়াবীন শেষ করে জায়নামাযে বসেই আল্লাহ আল্লাহ করছিলেন। তার পাশের ডেস্কে রাখা পাক কোরআন, হাদীস ও নতুন পুরাতন অনেক কিতাব। বিছানার উপর রাখা কয়েকটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। মেহমানরা সবাই কক্ষে গিয়ে বসলে শায়খ দাঁড়িয়ে কথা শুরু করলেন। হামদ ও সালাতের পর বললেন, "সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তথা খেলাফত আলা মিনহাজিন্ নবুওয়াত কায়েমের লক্ষ্যে; সর্বপ্রকার অন্যায়, জুলুম ও বাড়াবাড়ির মোকাবিলা করার জন্যে আপনারা যে জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তার গতি-প্রকৃতি, ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ায় বিশ্লেষণের পর মুরুব্বীগণ মনে করছেন যে, এর কর্মকৌশলে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার সময় হয়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলির ভেতর আমাদের কৌশল ও কূটনীতি প্রয়োগ করে তাদের তছনছ করে দেয়ার পন্থাও উদ্ভাবন করেছে আমাদের থিংক-ট্যাঙ্ক। শত্রু দেশগুলোকে মোট চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করবো। ইনশাআল্লাহ, আগামী বছরগুলোতে দুশমন টের পাবে যে ইসলামী শক্তি কতটা অপ্রতিরোধ্য।"

ঝুলানো একটা ম্যাপে লাঠির সাহায্যে তিনি আঞ্চলিক কিছু বিষয় বুঝিয়ে বললেন, সাতটি কর্মপরিকল্পনার ফাইল তুলে দিলেন মহাদেশীয় প্রতিনিধিদের হাতে। অন্যদের দিলেন বিকল্প সব ওয়েবসাইট ঠিকানা। একসেট করে কমপ্যাক্ট ডিস্ক দেয়া হলো সকল সাথীকে।

সবশেষে সবাই হাতে হাত রেখে যখন আমৃত্যু জিহাদের বায়আত করছিলেন
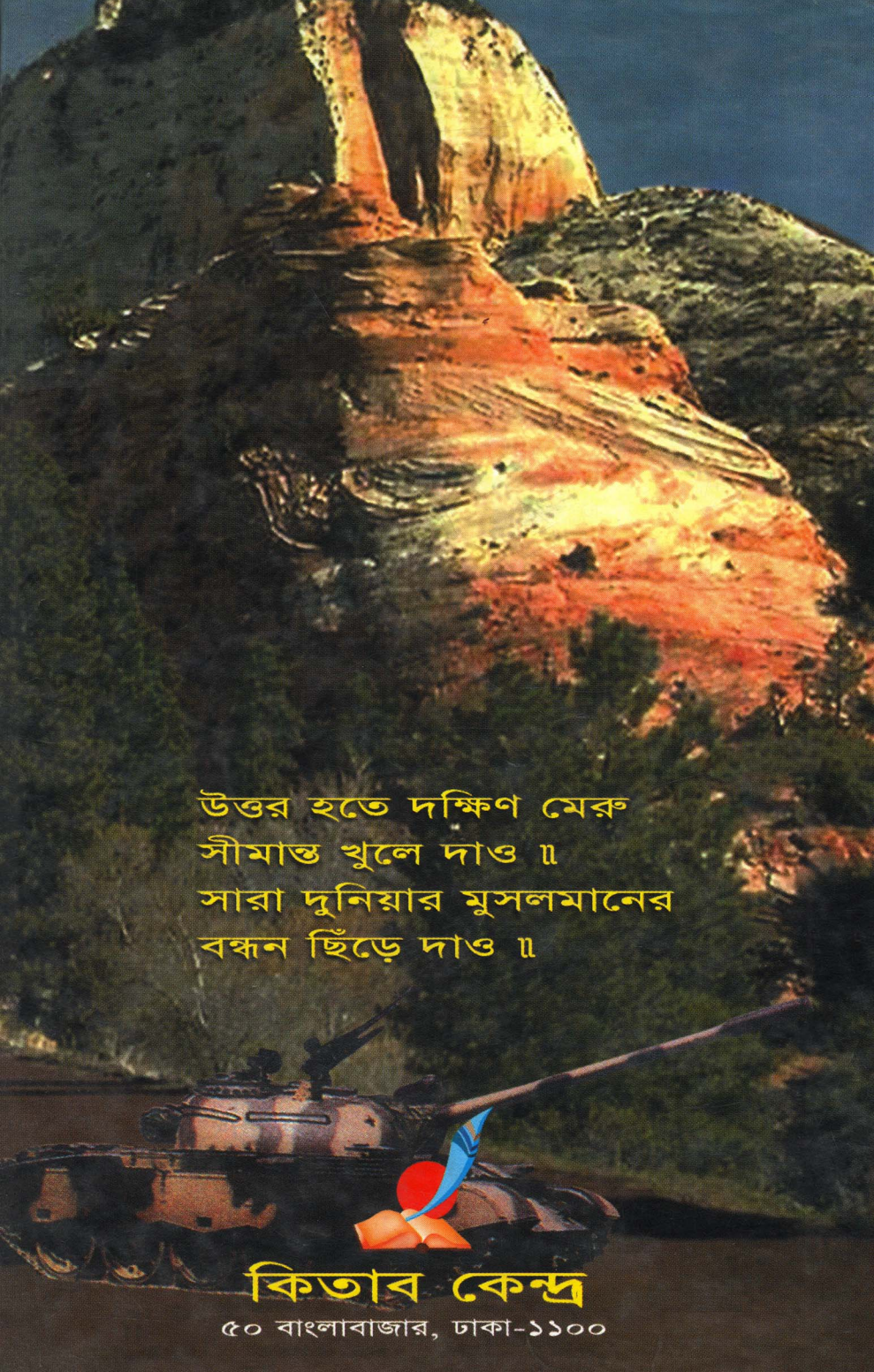
তখন হযরত শায়খ সাহাবী কণ্ঠের ঐতিহাসিক সে কবিতাটি পাঠ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম যেটি প্রায় সময়ই পাঠ করতেন। "আমরা সেই সম্প্রদায়, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে আমৃত্যু জিহাদের বায়আত করেছি।" হাদীসের এ পংক্তি শোনামাত্রই গোটা কক্ষে কান্নার রোল পড়ে গেলো। আকাশের পানে হাত তোলে বিশ্বমুজাহিদরা আজ হৃদয় উজার করা দোয়া আর মুনাজাতে নিমগ্ন।

এ সময় খালিদ বিন আতাউল্লাহ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ভাই ও বন্ধুগণ, এই মুহূর্তে দুটো সংবাদ পেলাম। এক জেরুজালেমের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা ঠিক সময় মতো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। দুই. আরব্য মহিলা মুজাহিদ নুসাঈফা ও তার অপর এক সাথী ইসরাঈলী সৈন্যদের একটি কোম্পানিকে ধ্বংস করে নিরাপদে জিহাদ মিশন ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। আর শেষ কথা হচ্ছে, হযরত শায়খ মুজাহিদে আজম এ সমাবেশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুদের জন্য ঘোষণা করছেন, 'ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত'। যা আগামী দিনগুলোতে তারা প্রতি পদে পদে টের পাবে, ইনশাআল্লাহ। এরপর একে একে নেতৃবর্গ গুহা বেয়ে বাইরে চলে আসতে লাগলেন। তাসনিম এগিয়ে গিয়ে মুজাহিদে আজমের হাতে চুমো খেলো। মুজাহিদে আজমের চোখ তখন পানিতে চিকচিক করছে। স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠা তার চেহারায় তখন পৃথিবীর সকল সুন্দর এসে বাসা বেঁধেছে। মুজাহিদে আজমের মুখে তখন একটিই কথা, "আল্লাহ সর্বাবস্থায় সকল স্থানে আপনাদের হেফাজত করুন। তিনি আমাদের শান্তি ও কামিয়াবীর পথ দেখান।"

উত্তর হতে দক্ষিণ মেরু
সীমান্ত খুলে দাও ॥
সারা দুনিয়ার মুসলমানের
বন্ধন ছিঁড়ে দাও ॥
কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০